দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

সিংহের গর্জনে
উত্তাল ব্রিগেড
— পৃঃ ২৬

এবার ভোটে বাঙ্গলা
সিদ্ধান্ত নেবে
বঙ্গসংস্কৃতি নাকি
মমতা-সংস্কৃতি
— পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ১৫ এপ্রিল ২০১৯।। ১ বৈশাখ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা -১৪২৬

৭১ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৫ এপ্রিল - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

'বুদ্ধি'জীবীদের চরিত্র বাঙ্গালি ধরে ফেলেছে ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে দিদি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

২০১৪ সালের জয়েরই পুনরাবৃত্তি করবেন মোদী ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

এবার ভোটে বাঙ্গলা সিদ্ধান্ত নেবে বঙ্গ সংস্কৃতি নাকি মমতা-সংস্কৃতি? ▯ সৃজিত রায় ▯ ১১

বাংলা সংবাদমাধ্যম এখন রাহুগ্রস্ত ▯ সুজাত রায় ▯ ২২

লোকসভা নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

মমতার স্পিডব্রেকার ব্যর্থ— শিলিগুড়িতে জনসুনামি ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৪

সিংহের গর্জনে উত্তাল ব্রিগেড ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৬

ওড়িশায় পরিবারতন্ত্র উপড়ে ফেলার ডাক মোদীর ▯ অশোক মাইতি ▯ ২৮

হিন্দু বিরোধীদের সর্বশক্তি দিয়ে পরাজিত করতে হবে : স্বামী অসীমানন্দ ▯ ২৯

নববর্ষের সম্ভাষণ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

কাটোয়া গৌরাঙ্গ মন্দিরের প্রাচীন সেবাইতের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার ▯ সমীর চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩২

বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্কট ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ৩৫

অবক্ষয়ের ভেদরেখা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৬

নববর্ষে আশার আলো ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ৩৭

ফিরে এসো সৌজন্য, ধ্বংস হোক টয়লেট রাজনীতি ▯ সনাতন রায় ▯ ৩৮

বাঙ্গালির নবজাগরণ ও হিন্দুত্বের ভাবনা ▯ একলব্য সোম ▯ ৩৯

বাংলা গান নিয়ে এখনই হতাশ হবার কিছু নেই ▯ তিলক সেনগুপ্ত ▯ ৪৩

দেশের যুবা প্রজন্ম দেশকে আরও শক্তিশালী দেখতে চাইছে ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২০-২১** ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৭**

With Best Compliments
From :

সকলের জন্য রহিল
বাংলা শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে ঃ-
Ram Chandra Agarwal
Advocate

With Best Compliments
From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,

1st Floor, Kolkata 700 001

Ph. +91 33 2248 1789/ 1790

Email : leadstone.intl@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নববর্ষে নব সংকল্পে উদ্দীপিত হোক বাঙ্গালি মানস

বঙ্গাব্দের আবাহনে কবি গাহিয়াছেন— 'এসো এসো হে বৈশাখ। তাপসনিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' বস্তুত বাঙ্গালি মানসে আবর্জনার পাহাড় জমিয়াছে। বাঙ্গলার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, এমনকী গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ প্রচারমাধ্যমও আবর্জনায় চাপা পড়িয়াছে। সত্য ঘোষণা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইতেছে। স্বঘোষিত কবি-সাহিত্যিকরা শিবমের হাতের সত্যকে অপবিত্র করিয়াছেন। রাজ্যের ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলের বাহুবলীরা পঞ্চায়েত ভোটে মানুষের রক্তে মাটি লাল করিয়া দিয়াছে। আসন্ন লোকসভার নির্বাচনী আবহে অকথা-কুকথায় রাজ্যের গ্রাম গ্রামান্তর কলুষিত হইতেছে। বঙ্গ সংস্কৃতির গরিমাময় ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাঙ্গালিকে ইহার জন্য অন্যত্র অপমানে মুখ লুকাইতে হইতেছে। বাঙ্গালি জনমানস ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছে।

নববর্ষ নূতন প্রাণের বার্তাবাহক। বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশের নিজস্ব অব্দ। বাঙ্গালির সাহিত্য-কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠান, পালাপার্বণ ও জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। কোনও আকস্মিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ইহার উদ্ভব ঘটে নাই। এ অব্দ আপনা হইতেও আসে নাই অথবা বাহির হইতেও আসে নাই। চৌদ্দশত বৎসরেরও পূর্বে বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গালি রাজা শশাঙ্ক ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষের সুবর্ণময় গুপ্তযুগে বৈশাখমাস হইতে বর্ষ গণনার প্রথম যে শুরু তাহারই অব্যাহত ধারা বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে প্রবহমান। গুপ্ত প্রশাসনের সহিত জড়িত থাকিবার কারণে ওই যুগের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী রাজা শশাঙ্কই ইহার প্রবর্তক, তাহাতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনও অবকাশ নাই। শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গাব্দের প্রচলন হইয়াছে গবেষকগণ তাহাতে ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত, বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি তাহার স্বকীয়ত্ব অর্জন করিয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, সংস্কৃতি সমন্বয়ের নাম করিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বঙ্গদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গাব্দকে মোগল সম্রাট আকবরের অবদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা দীর্ঘ সময় প্রচার করিয়াছেন যে, 'বঙ্গাব্দের ইতিহাস নাই, তাহার আরম্ভেই গোঁজামিল'। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালি মানসের যে অভূতপূর্ব উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল তাহাতে এই কায়েমি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহারা প্রথম হইতেই হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষে রত রহিয়াছে। তাহার ফলে বাঙ্গালি জীবন গভীর সঙ্কটের মুখে পড়িয়াছে। হিন্দু মনের যে স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাহা তাহাদের মনঃপুত নহে। এই সেইদিনও তাহারা প্রকাশ্য রাজপথে নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আস্ফালন জাহির করিয়াছে।

তবে আশার আলো দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালি মন কলঙ্কমুক্ত হইবার প্রয়াসে নব চেতনায় জাগিতেছে। পশ্চিমি অনুকরণে রাত্রির অন্ধকারে নয়, প্রভাত সূর্যের প্রথম কিরণে তাহারা নববর্ষকে আবাহন জানাইতেছে। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গভূমে বাঙ্গালি মানস নূতন ভাবে নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে মনস্থির করিয়াছে। বাঙালি যুবমানসেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসিয়াছে। পুরাতন বৎসর অতীত না হইয়া স্মৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া যাক। অমঙ্গল, অশুভ দগ্ধ হইয়া সত্য শিব সুন্দরের আবির্ভাব হউক। কবির কথায় 'মুছে যাক গ্লানি, মুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শূচি হোক ধরা।' নববর্ষে নব সংকল্পে উদ্দীপিত হোক বাঙ্গালি মানস।

সুভাষিতম্

সতং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।

সত্য বল, প্রিয় বল, কিন্তু অপ্রিয় সত্য এবং প্রিয় অসত্য কখনোই বলবে না — এটাই সনাতন রীতি।

‘বুদ্ধি’জীবীদের চরিত্র বাঙালি ধরে ফেলেছে

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মাঠে নেমেছেন, গত ১২ এপ্রিল। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, অন্তত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল বাংলা কবিতা সাম্রাজ্যে ‘খোদা’ রূপে খ্যাত মাননীয় শঙ্খ ঘোষ মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন। খোদার ওপর খোদকারিটা অত্যুৎসাহী ‘বুদ্ধি’জীবীরা করে ফেলেছিলেন। আসল ব্যাপার হলো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খোদাবাবুর বিলক্ষণ সমর্থন রয়েছে, তবে মিছিলের সামনে থাকতে তিনি নারাজ। তাই মিছিলের আহ্বায়ক হিসেবে নাম-ফাম তিনি তুলে নিয়েছেন। তা হোক, তবু মিছিল হয়েছে এবং গণতন্ত্র রক্ষার মহান দায়িত্ব, ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব তাঁরা স্বকন্ধে তুলে নিয়েছেন দেখে যারপরনাই আনন্দিত হওয়া যায়।

ঠিক একই আনন্দ আমরা ১৯৪২ সালে উপভোগ করেছিলাম। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশজুড়ে ‘ইংরেজ ভারত ছাড়ো’ ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ ভারত ছাড়ুক সেটা মোটেও ফ্যাসিবাদ বিরোধীরা চায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জোটশক্তির পক্ষে ইংরেজরা অক্ষশক্তির দুই মাথা অ্যাডলফ হিটলারের ন্যাৎসি বাহিনী, বেনিটো মুসোলিনীর ফ্যাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। আর ইংরেজদের সহযোগী কে ছিল জোসেফ স্ট্যালিন, রাশিয়া, চিয়াং কাইশেকের চীন এবং বলাই বাহুল্য ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের আমেরিকা।

এসব ইতিহাস সবাই জানেন। লেনিন যুগ তখন অতীত, মাও যুগ সমাগত। এরই মাঝে স্ট্যালিনের রাশিয়া আর কিছুটা কাইশেকের চীনের সঙ্গে একত্মবোধ করা কমিউনিস্ট নামক অতি প্রগতিশীল একটি গোষ্ঠী ইংরেজ ভারত ছাড়ো ডাক শুনে ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ঠিকই তো, একে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তার ওপর তাদের পিতৃ- মাতৃসম চীনের সংগ্রামী লড়াই ইংরেজ যাতে ভারত না ছাড়ে তার জন্য গান্ধীজী ওই আন্দোলনকে পেছন থেকে ছোরা মারতে বিশেষ দ্বিধা করেনি।

আসলে পুরোনো কাসুন্দিগুলো ঘাঁটতে হয় যখন দেখি আজও এরা ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনে। কেমনতর ফ্যাসিবাদ? এই যেমন ধরুন ভারতীয় সংসদে হানাদার ফাঁসির আসামি আফজল গুরুর মহাসমারোহে জন্মদিবস পালনে কেউ বাধা দিলে সেটি অবশ্যই চরম ফ্যাসিবাদী কাজ। তারপর ধরুন গিয়ে উরির হামলার পর

বিশ্বামিত্রের কলম

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা পুলওয়ামার পর বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক, নেহাত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয় ফ্যাসিবাদী না হলে এমন কাজ কেউ করে না। একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক, ১৯৬২ কিংবা ১৯৭১। ’৬২-তে চীন ভারত আক্রমণ করল। মাও-জে-দঙের সাম্রাজ্যবাদী চীন। ভারতের তো উচিত ছিল নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করা, বিশেষ করে নেহরুর মতো ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রধানমন্ত্রী যখন স্বমহিমায় গদিতে আসীন।

চীনের ভারত অধিগ্রহণ না করার দুঃখে ফ্যাসিবাদ-বিরোধীরা কত-শত স্লোগান তুললেন ‘চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান’, ‘বাংলা হবে ভিয়েতনাম’ ইত্যাদি। যাক পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী হবে। তবে এই যে আজকে ‘টুকরে টুকরে’ গ্যাঙের আবির্ভাব হয়েছে, যারা ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি’ বলে স্লোগান দেয়, যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধর্ষক সাজাতে চায়, মনে রাখবেন এদের সাংস্কৃতিক পূর্বসূরীরাই ৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খানসেনাদের অমানবিক, পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করেনি। অবশ্য সবটাই ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার মহান উদ্যোগ।

বাম আমলে প্রতিনিয়ত গণতন্ত্র যখন ভূলুণ্ঠিত হতো, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার সুমহান তাড়নায় এই ধরনের ‘বুদ্ধিজীবী’দের মুখে কুলুপ পড়তো। বাম-জমানার প্রথম দিকে এরা ‘জ্যোতি’তে উদ্ভাসিত হয়ে শাসকের তাঁবেদারি করত, পরের দিকে এঁরা ‘বুদ্ধি’জীবী হলেন। এখন মমতায় ঢাকা আছে। ‘সুবোধ’ কবি, শ্রী‘জাত’ কবি— ‘শঙ্খ’ ধ্বনিতে লক্ষ্য করুন, বিষয়টি দিব্যি বুঝে যায়। এঁদের কেউ প্রকাশ্যে দিবালোকে গো-মাংস খান, কেউ বা ত্রিশূলে কন্ডোম পরান, আবার কেউ তাঁর কন্যারত্নের মাধ্যমে ‘কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের মনের কথাটি বলিয়ে নেন।

‘ফ্যাসিবাদ’ বিরোধী লড়াইটাও এদের ইস্তাহারে এরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ‘খোদা’ কবি বলেছেন ফ্যাসিবাদী হইল গিয়ে বিজেপি, একে পরাস্ত করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। দুঃখ হয়, হাসিও পায়। রাজনীতি করা প্রতিটি ভারতীয়ের গণতান্ত্রিক অধিকার, এঁরা করুন না। কিন্তু নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে কেন, ‘ফ্যাসিবাদ’-এর ভ্রূকুটি দেখিয়ে কেন? নাকি তথাকথিত ফ্যাসিবাদ বিরোধীদের আসল ফ্যাসিস্ট মুখটিই প্রকাশ হয়ে পড়বে? নাকি এও প্রমাণ হবে সেলিব্রেটি হলেও মুসলমান পরিচয় আর সেকুলারিজম নামক হিন্দুদের দিগ্‌ভ্রান্ত করার কৌশলের আজও নিরন্তর প্রয়োগের চেষ্টা হচ্ছে। মোদী হঠাও, দেশের কারোর হিম্মত না থাকলে মাসুদ আজহার তো আছেই। বুদ্ধিজীবীদের মগজাস্ত্রে শান পড়েছে মাসুদ লাও-মোদী হটাও। চীন ভরসা। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে দিদি

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দিদি,

ভোটের বাজারে জানি আপনি খুবই ব্যস্ত। আমার চিঠি পড়বার সময় কোথায়! তবুও ডিস্টার্ব করছি দিদি। বেশ তো চাল, ডাল, সাইকেল নিয়ে ছিলেন। কেন আপনি নরেন্দ্র মোদীর পাতা ফাঁদে পা দিলেন বলুন তো! এখন মুকুল রায় মুখ খুলেছেন। হাটে হাড়ি ভাঙা শুরু হয়ে গিয়েছে। আপনারই তো নাম খারাপ হচ্ছে নাকি!

"গোটা দেশ মা সারদাকে পুজো করে, বাংলায় সেই সারদাকে কেলেঙ্কারির নাম দিয়েছেন দিদি। গোটা দেশ 'রোজ' বলতে ফুল দেওয়া নেওয়া করে, এ রাজ্যে 'রোজ' হলো কেলেঙ্কারির কাঁটা। নারদ বলতে নারদ মুনি ত্রিলোকে পূজিত হন, সেই নারদকে বাঙ্গলায় কেলেঙ্কারিতে নামিয়ে এনেছেন দিদি।" কোচবিহারে এইরকমই বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ব্যাস, আপনি আর মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না। ভোটে যে মাটি সরছে সেটা বুঝে মাথা গরম ছিল জানি কিন্তু এমন ফাঁদে কেউ পা দেয়।

রবিবার দুপুরে মাথাভাঙার সভায় মাথা গরম করে মুকুল রায়কে সঙ্গী করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন আপনি। বললেন, "সারদা, নারদা নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলেছেন, কিন্তু যে লোকটা আপনার পাশে দাঁড়িয়ে মিটিং পরিচালনা করছে সে তো সারদা, নারদা দুই কেলেঙ্কারিতেই অভিযুক্ত।"

ব্যাস। এর জবাব দিতে কোচবিহার থেকে কলকাতায় ফিরেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুকুল রায়। আর সেখানেই মারাত্মক অভিযোগ তুলে বললেন, "আমার নাম নেওয়ার সাহস হয়নি তাঁর। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করছি, তাঁর যদি সাহস থাকে তবে তিনি প্রমাণ করে দেখান আমি সারদাকাণ্ডে যুক্ত। প্রমাণ করতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব আর যে শাস্তি হবে তা আমি মাথা পেতে নিতে তৈরি আছি।"

এর পরেও মুকুল বলেছেন, "আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই তিনিই সারদার আসল সুবিধাভোগী। মমতাকে প্রোমোট করতে গিয়ে সারদার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। আমি সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনকে দুবার দেখেছি। সেটাও তাঁরই সৌজন্যে। একবার ডেলোয় আর একবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে।"

এ তো মারাত্মক কথা দিদি। আগে তো একথা বিজেপিও বলতে পারেনি। এখন আপনি যাঁর দিকে আঙুল তুলছেন তিনিই তো সব বলে দিলেন। উনিই তো আপনার সেকেন্ড ইন কন্যান্ড ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই সারদা কাণ্ডের তদন্ত শুরু করে ২০১৪ সালে, এবং মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৩০ জানুয়ারি, ২০১৫ সালে। মুকুলের ক্ষেত্রে তদন্তের কেন্দ্রে ছিল সারদার মিডিয়া সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা এবং সারদার চেয়ারম্যান সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। এখন মুকুল রায় তো বলছেন আপনিই বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আপনার সৌজন্যেই তাঁর সঙ্গে সারদাকর্তার পরিচয় হয়।

মুকুল রায়কে সিবিআই জেরা করার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে মুকুল রায়ের। বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয় সেই সময় থেকেই। এর পরে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালের নভেম্বরে বিজেপিতে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা বিশ্বস্ত সেনাপতি। এত কিছুর পরেও মমতা দিদি কখনও প্রকাশ্যে চিটফান্ড ইস্যুতে মুকুল রায়ের নাম তোলেননি। কিন্তু এখন তুললেন কেন! এটায় সত্যিই বিস্ময় লাগছে। তবে কি আপনি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন!

আপনি নারদাকাণ্ডে মুকুল রায় অভিযুক্ত বলেছেন। একদম ঠিক বলেছেন। তাই তাঁকে পাশে নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সভা করা ঠিক হয়নি বলেছেন। সেটাও ঠিক বলেছেন। আর এর জবাবে মুকুল রায়ের বক্তব্য, "কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অপরূপা পোদ্দার-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী, কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে নারদা ফুটেজে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। তবে কি মুখ্যমন্ত্রী মানবেন তাঁরাও নারদাকাণ্ডে যুক্ত?"

এটাও তো ন্যায্য প্রশ্ন। মনে আছে দিদি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন নারদাকাণ্ড সামনে এল তখন আপনি বলেছিলেন যে, আগে জানলে এদের প্রার্থীই করতেন না। তখন মুকুল রায় আপনার সঙ্গে। এখন মুকুল রায় নেই। কিন্তু নারদাকাণ্ডে অভিযুক্তরা সবাই আপনার সঙ্গে।

সব হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে দিদি। কে যে কোন কাণ্ডে যুক্ত আর অভিযুক্ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

—সুন্দর মৌলিক

২০১৪ সালে জয়েরই পুনরাবৃত্তি করবেন নরেন্দ্র মোদী

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

বালাকোটে বায়ুসেনার আক্রমণ হানার বহু আগে থেকেই আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলে আসছি ২০১৯-এর নির্বাচনে মোদী ২০১৪-এর ফলাফলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। জয় সম্পর্কে আমার নিশ্চয়তার কারণ কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।

প্রথমটি তো মোদী স্বয়ং, তা আর বলে দিতে হয় না। এ বিষয়ে কিছু দিল্লিকেন্দ্রিক সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবী যাই বলুন না কেন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা অটুট। সারা বছর ধরে রেডিয়ো প্রোগ্রাম করা, নিরন্তর সোশ্যাল মিডিয়ায় জুড়ে থাকা, অজস্র অনুষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি বারবার সফলভাবে সাধারণ দেশবাসীকে বোঝাতে পেরেছেন যে তিনি একজন যথার্থ আন্তরিক, কঠিন পরিশ্রমী ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম প্রধানমন্ত্রী। কিছু কিছু মানুষের তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনেকক্ষেত্রে পালিত না হওয়ার কারণে ক্ষোভ নিশ্চয় আছে। কিন্তু কারুরই তাঁর দেশ ও দেশের নাগরিকদের ওপর অটল দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো মোদীর মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার সহজাত অফুরন্ত ক্ষমতা। সকলেই মানবেন এই বিরল বৈশিষ্ট্যই স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁকে একজন অন্যতম সেরা নির্বাচনী প্রচারবিদ হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। যিনি হাতেনাতে ফল দেখাতে পারেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারযুদ্ধে তিনি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রচার করেছিলেন। কয়েকশো সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। আজ ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁর উদ্যমে কোনো ভাটা পড়েনি। ১৫০টি সভার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। আরও বহু ভাবনা চিন্তার স্তরে রয়েছে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে তিনি আর একবার নির্বাচনী লড়াইটিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মার্কিনি কায়দায় নিয়ে যেতে চান। তৃতীয় যে সুবিধেটা তাঁর দিকে যাচ্ছে সেটা হলো ভারতীয় জনতা পার্টির জোট বজায় রাখার সফল কৌশল। বলতে দ্বিধা নেই ২০০৪ সালে করা ভুল থেকে বিজেপি শিক্ষা নিয়েছে। সেই নির্বাচনের ঠিক আগেই দল কিছু কিছু জোটসঙ্গীকে দুমদাম ছেঁটে ফেলার কিছুটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডিএমকে-কে ছেড়ে দেওয়ার ফলে দল সংসদে ১৪ জন ডিএমকে সাংসদের সংখ্যা থেকে বঞ্চিত হয়। এবার কিন্তু বিজেপি জোটের গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করেনি। প্রয়োজনে তারা নিজেদেরকে নমনীয় করেছে অর্থাৎ স্বার্থ ছেড়ে দিয়েও পুরনো জোটসঙ্গীর ইচ্ছে পূরণ করেছে। দরকারে নতুন কিছু ছোটো দলকেও টেনে এনেছে।

চতুর্থত, এনডিএ-কে প্রভূত সাহায্য করছে একটি খাপছাড়া ও সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রস্তুতিহীন বিরোধী জোট। কংগ্রেস ও বহুবিধ আঞ্চলিক দলগুলির পরস্পরের মধ্যে এমন কোনো 'কমন' বৈশিষ্ট্য নেই শুধুমাত্র অন্ধ মোদী বিরোধিতা ছাড়া যা তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখতে পারে। আর আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে তা যথেষ্ট নয় কেননা বিএসপি-র মায়াবতী ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীর মুণ্ডপাত করছেন। তৃণমূলের মাথা মমতা ব্যানার্জিও তাঁর আক্রমণের বাইরে থাকছেন না।

বিরোধী দলগুলির মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসের একটি জাতীয় উপস্থিতি আছে। মনে পড়ে আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে ২০১২ সালে আমি ও ড. জগদীশ ভগবতী 'The bell tolls on India's Congress Party' শিরোনামের এক নিবন্ধে লিখেছিলাম ''নেহরু-গান্ধী ব্রান্ডের আবেদন নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে ২০১৪ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা অলীক।'' আজকেও বলছি গল্পটা আদৌ পাল্টায়নি।

নজর করলেই দেখা যাবে বিগত ৫ বছরে কংগ্রেস জনতার মধ্যে তার প্রভাব বাড়াতে কোনো পরিকল্পনাই নেয়নি। জাতীয় দল হিসেবে কোনো জাতীয় এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেনি, যা আদতে একটি প্রয়োজনীয় নির্বাচনী প্রচারের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এরই প্রত্যক্ষ পরিণতিতে দলে নীচু স্তরে কাজ করার কর্মীর একান্ত অভাব। রাহুল গান্ধীকে তাই জনতার মনযোগ আকর্ষণ করতে তাঁর প্রচার কেবলমাত্র 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগানের ওপরই দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়েছে। হ্যাঁ, বহু বিলম্বে তিনি নির্দিষ্ট দরিদ্র শ্রেণীর জন্য একটি সরকারি রাজস্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অবাস্তব এক নগদ টাকা পাঠানোর প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা জানি কর্মহীন, প্রকল্পহীন অর্থপ্রদান কখনই কোনো নীতিগত পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মোদী কায়মনোবাক্যে দেশ থেকে দুর্নীতির ধ্বংস চাইছেন এবং সর্বশক্তি ও দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি এ বিষয়ে পরিকল্পনা থেকে আইন সবই করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' গালি মানুষের মধ্যে রাহুলের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করছে। মোদীর এবারের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার এটি পঞ্চম কারণ অনায়াসে হতে পারে। বিগত ৫ বছরের শাসনকালে তাঁর সরকারের ওপর একটিও দুর্নীতির কলঙ্ক যে লাগেনি তা কিন্তু বিশাল আত্মশ্লাঘার বিষয়। এটি নিঃসন্দেহে সরকারের বড়ো কীর্তি।

একথা কেউই বলছে না যে, মোদী দেশ থেকে দুর্নীতিকে আমূল উৎপাটন করে ফেলেছেন। কিন্তু মানুষের মনে তিনি যে একজন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন যোদ্ধা সেই ভাবমূর্তি তিনি নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারত ইতিহাসে এমন ন্যায়পরায়ণ যোদ্ধা ভারত আর পায়নি। তাঁর এই নিরন্তর লড়াইয়ের ফলে সরকারের অনেক কাজেই digitisation ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছে। ফলে ছোটোখাটো কাজ পেতে সাধারণ মানুষকে যে 'হাতগরম' করার টাকা দিতে হতো তার থেকে তারা বেঁচেছে। অনেক সরকারি অধিকর্তাই এই ডিজিটাইজেশনের ধাক্কায় এমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন।

পঞ্চমত, যে কারণটি মোদীকে নির্বাচনে নির্ণায়ক বিজয় দেবে তা হলো মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনে আসে এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর কাজের সাফল্য। মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান করা। এই সূত্রে অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বিগত ১৫ বছরে কেউ হাত দেয়নি এমন তিনটি নীতিগত সাহসী সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। Insolvency & Bankruptcy Code, GST, Direct benefit Transfer তারই অঙ্গ। সাধারণ মানুষের জীবন ছুঁয়ে গেছে জনধন যোজনা, উজ্জ্বলা, স্বচ্ছ ভারত ও আধার। এই বিশাল দেশে এই ধরনের বিপুলাকার সব প্রকল্পের সাফল্য প্রমাণ করে তিনি বড়ো মাপের কাজ করার যোগ্য ও ক্ষমতাধর।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর সরকার অভাবনীয় বৃদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছে। এর ফলে ক্ষমতায় আসার প্রথম দিকে তাঁকে খাটো করার জন্য সেই সমস্ত সমালোচক যারা সর্বদাই ইউপিএ সরকারের থেকে দ্রুতগতিতে কাজের সাফল্যের কথা বলে গলা ফাটাতো তারা যোগ্য জবাব পেয়ে যায়। রাস্তা নির্মাণ, রেলপথের বৃদ্ধি, এয়ারপোর্ট থেকে জলপথে পরিবহণের মতো সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, আজকের তারিখে অজস্র রেলওয়ে লাইন পাতা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির বরাত দেওয়া রয়েছে। এগুলির দ্রুত সম্পাদন পরিকাঠামো ক্ষেত্রের চেহারাই আগামীদিনে বদলে দেবে।

সর্বোপরি, ছোটো ব্যবসায়ী ও শহুরে নাগরিকদের মধ্যে পরম্পরাগত ভাবে বিজেপির যে জনাধার ছিল তাকে অতিক্রম করে মোদী অত্যন্ত নিপুণভাবে গ্রামীণ অঞ্চলে কংগ্রেসের চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্কেও থাবা বসিয়েছেন। তাঁর শাসনকালের একেবারে প্রথমদিকেই তিনি তাঁর বক্তব্য কাজের অভিমুখ ও সামগ্রিক পরিকল্পনাগুলির বড়ো অংশ গ্রামীণ চাষি ও গরিবদের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট করেন। কৃষকদের জন্য তিনি ফসল বিমার সূচনা করেন। জমিতে যাতে পর্যাপ্ত সেচের জল যায় তাঁর ব্যবস্থাও নেন। একই সঙ্গে সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বা ভরতুকি পাওনা হয় তা সরাসরি ব্যাঙ্ক খাতায় পাঠানো শুরু করেন। তিনি শুধু মাত্র কৃষিপণ্যের যথার্থ বিপণনের জন্য যে e-national agricultural market-এর সূচনা করেন তা ভারতে প্রথম। গ্রামীণ গরিবদের জন্য সামগ্রিকভাবে তিনি ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা ঘাট, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, আবাস নির্মাণ, শৌচালয় থেকে গৃহস্থালীতে ধোঁয়াহীন রান্নার গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করে গ্রামীণ জীবনে বাঁচার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসেন। Employment Gurantee Scheme-এর রূপায়ণও এরই মধ্যে পড়ে। আমি নিশ্চিত, মানুষের জন্য এত ধরনের কল্যাণকর কাজের ফল হিসেবে একটি বিপুল নির্বাচনী জয় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com
Find us on Facebook

রম্যরচনা

মহাঠগবন্ধন

মায়াবতীর মূর্তি ঘোটালার জন্য সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিলেন অখিলেশ যাদব। বেআইনি খননের বিরুদ্ধে অখিলেশের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিলেন মায়াবতী।

সারদা কাণ্ডে মমতার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল কংগ্রেস। রবার্ট বঢরার জমি কেলেঙ্কারির মামলায় সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলেন কেজরিওয়াল।

কী বিচিত্র! তারাই আজ জোট বেঁধেছে আর বলছে মোদী নাকি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সবার পিছনে সিবিআই লেলিয়ে দিয়েছেন।

চাণক্য পণ্ডিত যথার্থই বলেছিলেন, চোর-ডাকাত-গুন্ডা-বদমাশ যখন এক হয়ে রাজার বিরোধিতা করবে, তখন জানবে রাজা ঠিক পথে চলেছেন।

উবাচ

"সব দলই নির্বাচনী ইস্তেহার জারি করেছে। একমাত্র বিজেপিই সংকল্পপত্র নিয়ে এসেছে। ২০১৪ সালে আমরা সংকল্পপত্রে যা সংকল্প করেছিলাম, তার চেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। বিশ্বে আমাদের দেশের সম্মান অনেক বেড়েছে।"

সুষমা স্বরাজ
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্র ঘোষণার পর বক্তব্যে

"নির্বাচন পর্বে কোনও আধিকারিককে বদলি করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। পুলিশ অফিসার বদলি সংবিধান মেনেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ দুর্ভাগ্যজনক।"

চন্দ্রভূষণ কুমার
ভারতের উপ-নির্বাচন কমিশনার

মমতার নির্বাচন কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের উত্তর

"হিন্দু বাঁচলে ভারত বাঁচবে। ভারতের জন্যই এবং ভারতের হিন্দুদের বাঁচার তাগিদেই মোদীকে ভোট দিতে হবে। ভারতের হিন্দুরা বিষয়টি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। এটি অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।"

চিত্রা পাল
সুইডেনের হিন্দু ফোরাম নেত্রী

ভারতের আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

"বাংলাদেশের আমরা বুঝি মোদী ছাড়া ভারতে উপায় নেই। ভারতীয়দের উচিত মোদীকে জয়ী করা এবং পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি প্রয়োজন। নইলে কিছুদিন পর কলকাতার বাবুদের অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিতে হবে।"

অরুণ দত্ত
কানাডার টরোন্টো শহরের বাংলাদেশ মাইনরটি কাউন্সিলের নেতা

ভারতে আসন্ন নির্বাচনী প্রসঙ্গে

এবার ভোটে বাঙ্গলা সিদ্ধান্ত নেবে বঙ্গসংস্কৃতি নাকি মমতা-সংস্কৃতি?

সৃজিত রায়

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ল। হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তারপরেই দেশের প্রায় ৯০ কোটি ভোটার সিদ্ধান্ত জানাবেন, ভারতবর্ষের নতুন প্রশাসক কে হবেন। গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই দামামা তুঙ্গে। সত্য-মিথ্যা, দ্বেষ-বিদ্বেষ, স্তুতি-ঘৃণা, সুবাক্য-কুবাক্য, শ্লীল-অশ্লীল, অম্ল-মধুর ভাষণের তরজার ধুন্দমার চলবে যতদিন না ভোটের ফল চূড়ান্ত হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ভোট-যুদ্ধে এটাই রেওয়াজ। পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক চলবে, বুদ্ধিজীবীরা বিতর্কে যোগ দেবেন, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজন গান বাঁধবেন, পথনাটিকার স্ক্রিপ রচিত হবে, সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ালে ওয়ালে ছড়িয়ে পড়বে ব্যঙ্গচিত্র, ব্যঙ্গাত্মক ছড়া, ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ আর রাস্তার মোড়ে, গ্রাম-শহরের আনাচে-কানাচে বড়ো মেজো সেজো, ন, নতুন, ছোটো নেতা-নেত্রীরা গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেবেন, রাস্তাঘাট, দেওয়াল জুড়ে চলবে রাজনৈতিক দলের আল্পনা আঁকা আর উদ্দাম স্লোগানে ঝালাপালা হবে কান। ভারতবর্ষের ভোটযুদ্ধ এটাই। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। হয়তো ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছবিটা থাকবে এমনই। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। কারণ পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানে আনন্দের উৎসব নয়। রক্তের হোলিখেলা। পশ্চিমবঙ্গের ভোট মানে অপসংস্কৃতির জোয়ারে রাজ্যকে ভাসিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের ভোট মানে মিথ্যার বেসাতি করা। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে অশ্লীলতার রাজনীতির জটিল আবর্তে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করা।

অদূর অতীতে পশ্চিমবঙ্গেও ভোট মানে ছিল উৎসব। ভোটের দিন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আর শহরের মধ্যবিত্ত পাড়াগুলিতে বয়ে যেত এক অদ্ভুত উন্মাদনা। বিশেষ করে মহিলামহলে কে কি শাড়ি পরবেন, কে কীভাবে চুল বাঁধবেন, কে কাকে ভোট দেবেন— এসব নিয়ে চলত জোরকদমে আলোচনা। রাজনীতির কথা ছিল কম। রাজনীতির বাইরের কথাই বেশি। আর ভোটের দিন সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে দল বেঁধে আলতা-পরা পায়ে ভোটের লাইনে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে তাঁরা ছিলেন মাসিমা, কাকিমা, ঠাকুমা, বৌদি। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র থাকত না। এমনকী লাঠিও নয়।

সে এক দিন ছিল।

দিনটা এখন বদলে গেছে। শুরু বামফ্রন্টের আমল থেকেই। তবে রাজনৈতিক ভোটের সংস্কৃতির আগাপাশতলা মুড়িয়ে গেল ২০১১ সাল থেকেই যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আমদানি হলো তৃণমূলি সংস্কৃতির। এ সংস্কৃতির কোনও ব্যাকরণ নেই। এ সংস্কৃতির কোনও ঐতিহ্যগত পরম্পরা নেই। এ সংস্কৃতিতে বলা হয় ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার কথা। এ সংস্কৃতিতে 'উন্নয়ন'কে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এ সংস্কৃতিতে ভোটারদের 'গুড়-জল, বাতাসা-জল, নকুলদানা-জল খাওয়ানো'র পরামর্শ দেওয়া হয়। এ সংস্কৃতিতে ভোটারদের 'পাঁচনের বাড়ি দেওয়া'র হুমকি দেওয়া হয়। এ সংস্কৃতিতে ভোট বাক্সকে বিরোধীশূন্য করে দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়। আর মানুষের সামনে উন্নয়নের প্রকৃত অর্থকে আড়াল করে গ্রাম-শহরের বহিরঙ্গে পাউডারের প্রলেপ দিয়ে দাবি করা হয়— এ উন্নয়ন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। এ রাজ্যে তাই ঘন ঘন 'বিজনেস সামিট' হয়। শিল্প হয় না, বরং বন্ধ হয় চালু শিল্প। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সপারিষদ ঘন ঘন বিদেশ যান শিল্পের কোমরে দড়ি দিয়ে আনতে। ফিরে আসেন টেমস আর রাইনের হাওয়া খেয়ে। এরাজ্যে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে যত বেশি সাইকেল দেওয়া হয়, তত বেশি বাড়ে স্কুলছুটের সংখ্যা। যত বেশি অর্থ দেওয়া হয় বই কেনার জন্য, তত বেশি মোবাইল ফোনের বিক্রি বাড়ে। ক্রীড়াখাতে উন্নয়নের নজির গড়তে যত বেশি অর্থসাহায্য করা হয়েছে ক্লাবগুলিকে, তত বেশি পিকনিকের সংখ্যা বেড়েছে, চটুল নাচ গানের আসর বসেছে তত বেশি। পিঠে উৎসব, ইলিশ উৎসব, বোরোলি উৎসব, মৌরলা উৎসব, পুঁটি উৎসব হতে পারে এ রাজ্যে বছরভর। কিন্তু ভোটটাকে 'উৎসব' হতে দেয় না শাসক দল। তাই ভোটের দিন গুনে গুনে লাশ পড়ে। বোমার আগুন ছিটকোয়। পিস্তলের গুলি ছোটে। ভোটের লাইন ফাঁকা হয়ে যায়। ভোটবাক্স ভরে ছাপ্পা ভোটে।

গত ৭ বছরে রাজ্যে যে কটি ভোট হয়েছে, সব কটিতেই অভিজ্ঞতা তাই। ভোটের আগে মানুষকে ভুল বোঝানো। ধরা পড়ার পর ভোটার পেটানো। ২০১৯-এর ভোট কী হবে কোন স্বতন্ত্র চেহারা নেবে?

এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস

> **বুঝিয়ে দিন এ রাজ্যের মাটিতে স্বৈরাচারের ঠাঁই নেই। তাই চলে যেতে হয়েছে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে। তাই চলে যেতে হয়েছে মেকি বামপন্থীদেরও। এবার ভোটে আনতেই হবে নতুন দিনের সূর্য, নতুন এক ভোরবেলাকে যার নাম গণতন্ত্র।**

বুঝে গেছে, মুখে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত বলুন না কেন--- ‘২০১৯, বিজেপি ফিনিশ’, তিনি নিজেও হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৬-র রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন এবং ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে গত তিন বছরে। সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ‘জনজাগরণ’ হিসেবে প্রচার করা হলেও মানুষ বুঝে গেছে, দুটি আন্দোলনই ছিল মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে শাসকদল আর দলনেত্রীর ব্যক্তিগত আখের গোছানোর কৌশল।

সেই আক্রমণ এখন আরও প্রবল, আরও প্রখর। এখন নেত্রীর লক্ষ্য ৪২টি লোকসভা আসনে ৪২ টাই তাঁর। অর্থাৎ তিনি চাইছেন--- পশ্চিমবঙ্গ হোক বিরোধীশূন্য। ভোটের লড়াইয়ে নয়, পাচনের বাড়িতে। ছাপ্পা ভোটে। বোমার বিস্ফোরণে। পিস্তলের গুলিতে। মা বোনের ইজ্জত কেড়ে নিয়ে। ছিন্নমস্তার মতো বিরোধীদের রক্তপান করে। যে মুখে তিনি উন্নয়নের বুলি আউড়ান, সেই মুখেই বলেন, ‘মনে রাখবেন, এ রাজ্যের গুন্ডাদের আমি কন্ট্রোল করি।’ যে মুখে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়ান, সেই মুখে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ‘গব্বর সিংহ’ বলে গালাগালা দিতে দ্বিধা করেন না। যে মুখে তিনি বাংলার মেয়েদের ‘অনুপ্রেরণা’ জোগান এগিয়ে যেতে, সেই মুখে তিনি মিথ্যা এবং ভুল ইতিহাস অনর্গল বলে যেতে দ্বিধা করেন না।

বাংলা সংস্কৃতিতে এখন একজনের অনুপ্রেরণা ছাড়া কেউ গান গাইতে পারেন না, কেউ নাটক করতে পারেন না, কেউ যাত্রাপালায় অভিনয় করতে পারেন না, কেউ নাচতে পারেন না, কেউ কবিতা, ছড়া, গল্প লিখতে পারেন না। অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্য পাবার জন্য মেলায়, খেলায়, সার্কাসে, গ্রামেগঞ্জে শহরে, দিনে রাতে, দুপুরে, সাদা শাড়ির আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ান শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলীরা। ১৯ জুলাই-এর মধ্যে একটু দাঁড়াবার ঠাঁই যদি মেলে, যদি ইলিশ উৎসবে বিনি পয়সায় একটু ইলিশের ভাপা চাখার আমন্ত্রণ মেলে, যদি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে মুখ দেখাবার একঝলক সুযোগ পাওয়া যায়। তাহলে সব সম্মান, সব যশ, সব ব্যক্তিত্ব হারায় হারাক, শাসকের প্রসাদ থেকে অন্তত বঞ্চিত হতে হয় না। তাই রাতারাতি ‘উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে’ কলকাতার সব সিনেমা হল থেকে একটা জলজ্যান্ত সিনেমা ‘ভবিষ্যতের ভূত’ ভূত হয়ে যায়। এই কর্তৃপক্ষটি কে তা মানুষ বুঝে গেলেও, তিনি নির্দ্বিধায় বলে দেন, ‘আমি এসব কিছু জানি না।’

পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এখন সব কিছুই দেখতে হচ্ছে নতুন চশমা পরে। তাই দেখতে হয় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর হোর্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার বড়ো ছবির নিচে এতটুকু রবীন্দ্রনাথকে। নজরুল জন্মজয়ন্তীতে তাঁর পদতলে ছোট্ট নজরুলকে। তাই জানতে পারি, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কিংবা কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর স্মরণসভাও হয় তাঁর অনুপ্রেরণায়। সেখানেও তাঁর মুখব্যাদানের ছবি জ্বলজ্বল করে। Legends of Bengal নামাঙ্কিত হোর্ডিংয়ে সারবন্দি প্রয়াত স্মরণীয় ব্যক্তিদের ছবির সঙ্গে তিনিও জ্বলজ্বল করেন। সবই নতুন করে শিখতে হচ্ছে— শিখতে হচ্ছে— প্রতিবাদ করলেই তিনি হবেন মাওবাদী। তাঁরা সমাজে নয়, কারাগারে থাকবেন। সত্য কথা বলা যাবে না। আপনার ঠাঁই হবে কারাগারে। আপনি যদি প্রতারক হন, মুখ্যমন্ত্রী আপনার সমর্থনে রাজপথে নির্লজ্জের মতো ধরনায় বসবেন। চিটফান্ড প্রতারিতরা আর্তনাদ করলে, পুলিশের লাঠিতে তাদের মাথা ফাটাবে। আর তার প্রিয় ভাই অনুব্রত মণ্ডল ‘চড়াম চড়াম’ ঢাকের বাদ্যির হুমকি দিলেও তিনি আদর করে বলবেন, আহা! বেচারা মাঝে মাঝে অক্সিজেনের অভাবে ভোগে। তাই ভুলভাল বলে ফেলে।’

গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে গত ৭ বছরে তিনি উন্নয়নের নামে ভিখারির রাজ্যে পরিণত করেছেন। গরিব মানুষের সামনে দু’টাকা কেজি চাল, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যশ্রীর মতো ‘ডোল পলিট্রিক্স’-এর টোপ ঝুলিয়ে তাদের হাতে বাটি ধরিয়ে দিয়ে শিরদাঁড়াগুলো কেড়ে নিয়েছেন। ঠিক যেভাবে নিজেকে মাফিয়া সর্দারণি হিসেবে পরিচিত করেছেন, ঠিক সেইভাবেই কলেজে-কলেজে, স্কুলে-স্কুলে, পাড়ায়-পাড়ায় তরুণ যুবসমাজের হাতে ঝান্ডার নামে ডান্ডা তুলে দিয়ে শিখিয়েছেন--- মাস্টারদের মারো, অধ্যাপকদের মাথা ফাটাও, অধ্যক্ষকে চেয়ার থেকে টেনে নামিয়ে দাও, প্রতিবাদীদের পিঠের চামড়া গুটিয়ে দাও। সাংবাদিকদের কলম কেড়ে নাও, আলোচনা সভায় বসে অযৌক্তিক কথা বলে সব গুলিয়ে দাও। বোকা বোকা কথা শুনে লোকে হাসলে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দাও। তাই ভোট এলেই এখন মানুষ তৈরি হয়ে যায় লাশের পাহাড় গুনতে। মানুষ বুঝে গেছে, এ রাজ্য এখন এক মহিলা স্বৈরাচারীর হাতে যিনি হিটলারও বেঁচে থাকলে সেলাম জানাতেন। স্ট্যালিন অবনত হতেন।

সামনেই ভোট এ রাজ্যেও। এবার মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবেন তাঁরা। বঙ্গসংস্কৃতিকে, নাকি মমতা সংস্কৃতিকে? কোন রাজনীতিকে সম্মান জানাবেন তাঁরা? নীতির রাজাকে নাকি ‘রানি’র নীতিকে? কোন ইতিহাসকে স্মরণ করবেন তাঁরা? বহুত্ববাদের ইতিহাসকে? নাকি মুসলমান তোষণের ইতিহাসকে? রাজ্যের মুসলমান ভাই-বোনেরাও আজ বুঝে গেছেন, দিদির তোষণ মানেই শোষণ। প্রতিটি মুসলমান গত ৭ বছর ধরে দেখেছেন, হিজাব পরে আল্লার দোয়াভিক্ষা করাটা মুখ্যমন্ত্রীর নাটুকেপনা চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তিনি কিছুই করেননি। তাঁরা শিক্ষায় এগোননি। তাঁরা চাকরি পাননি। তাঁরা ব্যবসার সুযোগ পাননি। অথচ শুধু মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য নুসরত জাহানের মতো তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীকে লোকসভার প্রার্থী করেছেন।

সময় এসে গেছে এবার বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করার। একথা ঠিক, প্রকাশ্যে প্রতিবাদের সুযোগ নেই। কারণ প্রতিবাদ মানেই এ রাজ্যে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া। নিঃশব্দে প্রতিবাদ করুন। ‘হোক কলরব’ বলে স্লোগান তোলার দরকার নেই। কলরব হোক ইভিএম মেশিনে। বিশ্বের প্রথম স্বৈরাচারিণীকে একটু শিক্ষা দিন। বুঝিয়ে দিন এ রাজ্যের মাটিতে স্বৈরাচারের ঠাঁই নেই। তাই চলে যেতে হয়েছে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে। তাই চলে যেতে হয়েছে মেকি বামপন্থীদেরও। এবার ভোটে আনতেই হবে নতুন দিনের সূর্য, নতুন এক ভোরবেলাকে যার নাম গণতন্ত্র।

রাজ্য রাজনীতি

বাংলা সংবাদমাধ্যম এখন রাহুগ্রস্ত

সুজাত রায়

১৯৬৭ সাল। বাংলার মসনদে তখন কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী নিপাট ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তাঁর প্রধান সহচর রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। রাজ্য জুড়ে তখন চলছে খাদ্যাভাব। ১৯৬৫-র খাদ্য আন্দোলনের রেশ তখনও কাটেনি। কী কুক্ষণেই প্রফুল্ল সেন বলে ফেলেছিলেন, ভাত না মিললে কাঁচাকলা খান। পুষ্টিগুণ একই। ভোটের বাজার তখন তুঙ্গে। প্রফুল্লবাবু আরামবাগের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। এমন সময় মঞ্চের সামনে এক ঘর্মাক্ত কৃষক। কাঁধে লাঙল জোয়াল। সপাটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে, ‘‘সেনবাবু আপনি কাঁচাকলা খেয়ে এই লাঙল জোয়াল কাঁধে দশ পা যেতে পারবেন? আমরা রোদে জলে লাঙল চালাই। আমাদের ভাত না হলে চলে?’’ গোটা জমায়েত স্তব্ধ।

পরদিন প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রথম পাতায় বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে বেরোল খবরটা।

আবার একদিন আরামবাগ থেকে গৌরহাটির পথে যাচ্ছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁকে গির্জাতলা। তাঁর জিপের মুখোমুখি ব্রেক কষল আর একটা জিপ। প্রায় ধাক্কা লাগে লাগে। সামনের জিপ থেকে নেমে এলেন অজয় মুখার্জি।

বাংলা কংগ্রেস নেতা এবং পরবর্তীকালে যিনি দু'দফায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়ভার সামলেছেন। অজয় মুখার্জিকে দেখে জিপ থেকে নেমে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনও। খাদির ধুতির ঘুঁটে ঘর্মাক্ত ঘাড় মুছে অজয় মুখার্জিকে বললেন হাস্যমুখে, ‘অজয়, ভোট করতে এসে চেহারাটার কী হাল করেছ? দেখেছ আয়নায়? তুমিই জিতবে।’ তারপর দুই বন্ধুর কোলাকুলি এবং যে যার গন্তব্যে যাত্রা।

পরদিন এ খবরও বেরিয়েছিল সব সংবাদপত্রেই। আর দাদাঠাকুর সেই যিনি খবরের কাগজ চালাতেন হাসিমুখে আর ভোটের সময় ভোটরঙ্গের গান বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সেই গান শুনিয়ে কাগজ বেচতেন— ভোট দিয়ে যা আয় ভোটররা..., তিনি বলছেন, ‘‘এম এল এ কথার পুরো অর্থ জানো না? তা শুনে নাও। পরের কাজে ভাতা মেলে। ভাড়া মেলে। এ মেলে। সে মেলে। তা মেলে। সব মেলে। তাই এম এল এ।’’এসবও বেরোত বাংলা কাগজে। সেকালে।

আর একালে?

বাংলা সাংবাদিকতা যখন দুশো বছর পার করে দিয়ে আরও একশোর পথে যাত্রা শুরু করেছে, তখন এই ২০১৯-এর ভোটবাজারে সেই বাংলা সাংবাদিকতার হাল কেমন?

এক কথায় হাস্যকর। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত ভয় আর আত্মসম্মান মুছে ফেলা এক নির্লজ্জ নগ্ন অচেনা অজানা ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিপরীতমুখী একটি ব্যবসায়িক কঙ্কাল যে শুধু শাসকের তল্পিবাহকেরই দায়িত্ব নিতে পারে। সামাজিক দায়বোধকে উপেক্ষা করে দু' কানকাটা বেহায়ার মতোই।

ইতিহাস অবশ্য বলে, ভোট বাজারে বাংলা সংবাদপত্রের মহীরুহরা চিরকালই নাকি শাসকের ধামাধরা ভূমিকাই পালন করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত সত্য যে মুষ্টিমেয় মিডিয়াকে শাসকদল টাকার জোরে কিনে নেয় ঠিকই কিন্তু ২০১৯-এর মতো সমস্ত বাংলা মিডিয়াকে

"মানুষ যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়,
তবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে যদি বিশ্বের
সব সম্পদ ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলেও
তার উন্নতি সম্ভব নয়।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

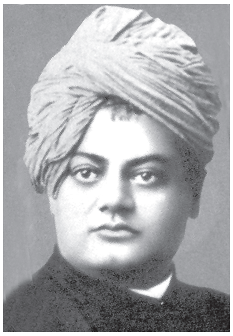

A Well Wisher

(A.B.)

With Best Compliments

From :

S E Builders and Realtors Ltd.

'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South)

Kolkata, Pin - 700 046

কিনে নেওয়ার স্পর্ধা কংগ্রেস সরকারও কখনও নেয়নি— এমনকী সেই যুগেও, যখন দু-চারটি মিডিয়ার উপস্থিতিই ছিল ভরসা। বিশেষ করে এমন একটা পরিস্থিতিতেও যখন বাঙ্গলার বুকে ত্রিমুখী/চতুর্মুখী লড়াই জমজমাট।

বাংলার সংবাদমাধ্যমের গতিপথ এখন একমুখী। বাংলা মিডিয়ার সম্রাট আনন্দবাজারগোষ্ঠী থেকে শুরু করে একদা সম্পূর্ণ বামপন্থী ঘরানার সংবাদপত্র আজকালও। দু'শো পাঁচশো কপি ছাপা হয় এমন বাংলা দৈনিকগুলি আরও বেশি মাত্রায় একপেশে। এমনকী প্রায় সব টেলিভিশন চ্যানেলও ক্যালকাটা নিউজের মতো ২/১টি টিভি চ্যানেল ছাড়া সবাই সরকারের বশংবদ। কিছুটা স্বেচ্ছায়, কিছুটা বাধ্যতায়। কারণ বাংলা মিডিয়া আজ স্বেচ্ছাচারী মমতা সরকারের তীব্র রাজনৈতিক চাপে অস্তিত্বরক্ষার সংকটে শয্যাশায়ী। প্রচারসর্বস্ব মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞাপনের ঝাঁপি খুলে নিজস্ব শ্রীমুখ সহ হাস্যকর সব সরকারি বিজ্ঞাপন জনগণের টাকায় বিলোবার জন্য বসেছেন হাঁটুমুড়ে। আর তাঁকে ঘিরে হাত পেতে দাঁড়িয়ে গেছেন 'দিগগজ' সব সম্পাদককুল আর 'প্রবীণ ও নমস্য' সব সাংবাদিকরা যাঁরা মনে করেন, ব্যবসাটাই মুখ্য, বাকি সব গৌণ। অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্র হাতে সংবাদমাধ্যমগুলির মালিকরা পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুল বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। ফলে বাংলা মিডিয়ার মাঝিরা যখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন, এই সরকারের তরী নিমজ্জমান, আয়ু ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, তখনও তাঁরা খবরের ৭০ শতাংশই নিবেদন করছেন শাসকদলের কল্যাণে। যাতে সরকারটাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। ফলত লক্ষণীয়, আনন্দবাজার গোষ্ঠী তার শ্রেণীচরিত্র (সরকার বিরোধিতা) পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। আজকাল রাতারাতি বামপন্থা ছেড়ে তৃণমূলের না বাম না ডান, বলা যায় ধান্দাবাজি এবং সুযোগসন্ধানী পন্থার সমর্থক হতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান যাঁর সম্পাদক এবং মালিক ছিলেন বরুণ সেনগুপ্তের মতো অকুতোভয় সাংবাদিক, সেই বর্তমানও আজ শাসকদলের সর্বশ্রেষ্ঠ মোসাহেবে পরিণত হয়েছে। এই সংবাদপত্রে প্রায় নিত্যদিন যখন খবর বেরোয় ছবি বেরোয় এক তৃণমূল বিধায়কের যিনি ওই সংবাদপত্রেরই বরিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন দীর্ঘদিন তখন কিন্তু সাপ্তাহিক বর্তমানের প্রাক্তন সম্পাদক এবং কলামনিস্ট এবার ভোটে প্রার্থী হলেও তাঁকে নিয়ে লেখা হয় যৎসামান্যই। টেলিভিশন চ্যানেলগুলি এখন প্রকৃত অর্থেই বোকা বাক্সের সম্মান রক্ষা করছে। কারণ রাজনৈতিক খবরের ঝুলি থেকে বেড়াল মাঝে মধ্যে উঁকি মারলেও, রাজনৈতিক আলোচনাগুলি যে নিতান্তই সাজানো চিত্রনাট্য তা বুঝতে কোনও বঙ্গসন্তানেরই আর বাকি নেই। তাই এবিপি আনন্দে দিনের পর দিন পাউডার মেখে এসে বসেন বিজন সরকার নামক অর্ধশিক্ষিত অকালপক্ক শিক্ষক যিনি যুক্তিতর্কে যুক্তির ধারই মানেন না। ইতিহাসেও গণ্ডমূর্খ। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজের এক প্রাক্তন অধ্যাপক প্রতিদিন ৩/৪টি কোটেশন মুখস্থ করে আসেন আর সন্ধ্যার অবসরটা যাপন করেন এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে ঢুঁ মেরে।

আসলে বাংলা সংবাদমাধ্যম এখন রাহুগ্রস্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক স্বৈরাচারিণী যেমন ভাবে তাঁর দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের অর্থবশে রসেবশে রেখে সকলের মুখে লিউকোপ্লাস্ট আটকে দিয়েছেন, সেই ভাবেই বাংলা সংবাদমাধ্যমেরও চোখে ঠুলি আর মুখে মাস্ক বেঁধে দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন গত ৮ বছর ধরে। ঠিক এই মুহূর্তে তাই মনে পড়ে আমেরিকান সংবাদ বিশ্লেষক বেন হেগ বাগদিকিয়ান-এর প্রবন্ধ The Press and Its crisis of Identity-র কয়েকটা লাইন। তিনি বলেছেন, 'আজকের বৃহৎ সংবাদপত্র পুঁজির মালিকরা নিঃসন্দেহে সম্মানীয়। তবে পুলিৎজার ও স্ক্রিপস আজ আর তাঁদের আমলের মতো করে সংবাদপত্র চালাতে পারতেন না। এর কারণ তাঁরা খারাপ লিখতেন তা নয়, তাঁদের লেখাগুলো আজকের দিনের মাপকাঠিতে বড়ো বেশি বৈপ্লবিক ও বিদ্রোহী বলে গণ্য হতো।" (Ref. Mass Media in a Free Society, Ed. by Warren K. Agree)

বেন হেগের এই বক্তব্য বোধহয় আজকের বাংলা সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। তা যদি না হতো, তাহলে আজ অনুব্রত মণ্ডল সংবাদমাধ্যমে নয়, ঠাঁই পেতেন ধাবার মাঠে। ফিরহাদ হাকিমকে লুকোতে হতো ভাগাড়ে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় হতো ২০১৯-এর ভোট রাজনীতির কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook E-mail : drsinvestment@gmail.com

লোকসভা নির্বাচন ও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম

অভিমন্যু গুহ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে সংবাদমাধ্যম হলো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আর নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। সুতরাং নির্বাচন কালে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেই। কিন্তু তারা কী ভূমিকা পালন করছে বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে তা মানুষ খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছেন। বেশ কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী স্বস্তিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম বামপন্থী নীতি-ভিত্তিক, সংবাদমাধ্যমের পক্ষে এই প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়। কথাটা যে কতটা খাঁটি বর্তমান সময়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতির দুটি অভিমুখ থাকে। একদিকে থাকেন জাতীয়তাবাদীরা, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা। ব্রিটেনে রয়েছে কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টি। আমেরিকায় রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট। এদের বাইরেও আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় সত্তা নিয়ে আরও কিছু দল রয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সমস্ত দল এককাট্টা হয়ে যায়, তা হলো দেশের স্বার্থ রক্ষা। দেশের স্বার্থে আঘাত পড়লে কোনও সংবাদমাধ্যম চুপ করে বসে থাকে না। তারা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী, সেটা তখন গৌণ হয়ে যায়। ভিন্ন মতাদর্শের সরকারের পাশে দাঁড়াতেও তারা দ্বিধা করে না।

সংবাদমাধ্যম কেন বিশেষ কোনও মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে, অন্তত গণতন্ত্রের পক্ষে এই লক্ষণ যে তেমন সুখকর নয় একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উদারনৈতিক ভাবনায় এই চিন্তা ক্ষতিকর নয় যে সংবাদমাধ্যম রাজনৈতিক মতাদর্শের বহির্ভূত থাকবে। ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের মতো দেশ যেখানে শিক্ষিত লোকের হার বেশি, তার তুলনায় ভারতে প্রথাগত ভাবে শিক্ষার হার যে অনেক কম তা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে সচেতন করতে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে অধিক যত্নশীল হতে হবে এটাই কাম্য।

এ তো গেল জ্ঞানের কচকচির কথা। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিটা কিন্তু খুব ভয়ংকর। এখানে প্রথাগত ভাবে শিক্ষাহীনের থেকে অর্ধশিক্ষিতরা অতি ভয়ংকর। ভারতবর্ষে 'উস্কানি' নামক বস্তুটি এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং এদের প্রচারের হাতিয়ার

রাজ্য রাজনীতি

বেশ কিছু চিহ্নিত প্রচারমাধ্যম। বিষয়টি গোড়া থেকে বলতে হবে। পুরো ইতিহাসে এই স্বল্প পরিসরে ঢোকা সম্ভব নয়। খুব সংক্ষেপে এই কথাটি স্বস্তিকার পাঠকদের জেনে রাখা প্রয়োজনীয় যে, মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) তাসখন্দে গিয়ে যে-যুবকদের সংগ্রহ করেছিলেন ভারতীয় বিপ্লব পরিচালনার জন্য তারা প্রত্যেকেই ছিলেন জেহাদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ।

কমিউনিস্ট-জেহাদি যোগের সঙ্গে আরও একটি বিস্ফোরক তথ্য হলো ব্রিটিশ সরকার যেহেতু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থসিদ্ধির যুদ্ধে নেমেছিল, জেহাদি কমিউনিস্টরা কখনই অন্তর থেকে তাগিদ অনুভব করেনি ব্রিটিশদের ভারত থেকে উৎখাত করতে। যে কারণে তারা ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সাবোটেজ করবার যাবতীয় ষড়যন্ত্র তৈরি করেছিল। পাকিস্তানের দাবির অত্যুগ্র সমর্থক কমিউনিস্টরা স্বাধীনতার পরও দেশবাসীর সঙ্গে কী চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার উদাহরণ তো ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধ, যেখানে চীনের পক্ষাবলম্বন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির বড়ো একটি অংশ, নতুন দলই তৈরি হয়ে গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া(মার্কসিস্ট) নামে। পরে এই দলটিও ভেঙে তৈরি হলো সিপিআই (এমএল), অর্থাৎ যাদের নকশাল বা মাওবাদী নামে দেশবাসী জানে। দেশের মনীষীদের মূর্তি ভেঙে অপমান আর লুঠতরাজ, গুন্ডামি ও খুনখারাবি ছাড়া ভারতীয় গণতন্ত্রে যাদের আর কোনও অবদান নেই।

এই ইতিহাস সবাই জানেন। আরও বিস্তারিত ভাবেই জানেন। কিন্তু কথাগুলো বলতে হলো আজকের সংবাদমাধ্যমের চরিত্রটি বোঝাবার জন্য। একটি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর লেখা থাকে জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র, আর তার সম্পাদকীয় ও উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি নকশালি ধ্যানধারণায় পরিপূর্ণ। কেমন সেই ধ্যানধারণা? যেমন ধরুন ভারতবর্ষ আদতে একটি খেতে না পাওয়ার দেশ, 'বুর্জোয়া' শব্দটি এখন গালাগাল বাচক, তাই এই শব্দটি পত্রিকার পাতায় ব্যবহার হয় না। কিন্তু তা না হলেও প্রবন্ধগুলিতে লোক খেপানোর রসদ যথেষ্ট থাকে এবং প্রবন্ধ

লেখকদের প্রত্যেকেরও ‘নকশাল ব্যাকগ্রাউন্ড’ রয়েছে।

যে সংবাদমাধ্যম একটি বিশেষ মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং যে মতাদর্শের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে দেশ বিরোধিতার, তাদের কথার বিন্দুমাত্র দামও কি সাধারণ মানুষের কাছে রয়েছে? সংসদীয় গণতন্ত্রে একটি নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের এই অধিকার অবশ্যই আছে কোনও দলের বিরোধিতা করার। কিন্তু একটি বিশেষ মতাদর্শের বা গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করলে সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় কি? খেটে খাওয়া সাংবাদিকদের অবস্থাটা ‘ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’-এর মতো। পূর্ব ভারতের তথাকথিত ‘এক নম্বর দৈনিক’ ওই বাজারি পত্রিকার নীতিই হলো সরকার বিরোধিতার মোড়কে দেশবিরোধী ভাবনায় উস্কানি দেওয়া। টাকার লোভে এদের সাংবাদিককুলও সেইভাবে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে। এটা করতে গিয়ে তাদের একের পর এক সংস্থায় তালা পড়েছে, শয়ে শয়ে কর্মী ও সাংবাদিক ছাঁটাই হচ্ছেন, তবু ভারত বিরোধিতায় তারা অনড়। কারণটা কী?

শহুরে নকশালরা সুখের পালঙ্কে শুয়ে নিরীহ গরিব-গুর্বো মানুষকে খেপিয়ে তুলছে, আজকের ভারতবর্ষে এটি প্রমাণিত সত্য। এই বাজারি পত্রিকাটিকে দেখলে সেটি আরও ভালাভাবে বোঝা যায়। এই পত্রিকার শীর্ষ পদাধিকারীরা (যাঁরা আবশ্যিক ভাবে নকশাল) তারা বহাল তবিয়তে আছেন, আর চাকরি হারাচ্ছেন সাধারণ কর্মচারীরা (প্রেস কর্মী থেকে সহ সম্পাদক অবধি)। দেশবাসী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন, একের পর এক সংস্থায় তালা ঝুলছে। নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে। তা সত্ত্বেও দেশের খেয়ে, দেশের পরে সেই দেশেরই বিরোধিতা কী কেবল অন্ধ আদর্শের টানে। আদর্শটি এতই বিপথগামী যে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেউ করবেন তা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তবে কি এই বাজারি পত্রিকার বিদেশি জোগানদার রয়েছে? সব দেশেরই কৌশল থাকে বিপক্ষে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রাখা। এদেশের আরবান নকশালরা এই ভাবে পাকিস্তান-চীনের কাজ সহজ করে দিয়েছে। বাজারি পত্রিকাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এদের চীন প্রীতি, অধুনা পাকিস্তান ও রাশিয়া প্রীতি বুঝিয়ে দেয় টাকার জোগানদার কারা। এই যদি পরিস্থিতি হয় তবে তো বলতেই হবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের কাঠামোটি ঘুণে ভর্তি, যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বিপর্যয় ঘটবে।

বাজারি পত্রিকার কথা ছেড়ে দিন, এবার অন্যান্য পত্রিকার প্রসঙ্গে আসুন। বাজারি পত্রিকার পরেই যে পত্রিকার স্থান সেই ‘এই সময়’ পত্রিকাটির সম্পাদক বহুদিন যাবৎ জেলের ঘানি টানছেন, চিটফান্ডের কারণে। তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতায় চিটফান্ডগুলি রাজ্যের সাধারণ গরিব মানুষের টাকা লুঠ করেছেন, তৃণমূলের প্রচার কৌশলের অন্যতম মুখ ছিলেন তারা। এদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলি গণতন্ত্রের চতুর্থ‘ স্তম্ভের মর্যাদা যেভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছে, তার রেশ আজও চলছে। এখন চিটফান্ড নেই, কিন্তু তৃণমূল প্রশাসন এমনভাবে পুরো বিষয়টি সাজিয়েছে যাতে সংবাদমাধ্যমগুলি তাদের মুখাপেক্ষী থাকতে বাধ্য হয়। সেই বিজ্ঞাপন হোক কিংবা প্রচার এজেন্সি—তৃণমূল ব্যতীত গতি নেই।

এখানকার সংবাদপত্রগুলির আর একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন। ‘ভারতমাতা কী জয়’ স্লোগানে এদের তুমুল আপত্তি। একে এরা বিজেপির স্লোগান বলে দেগে দিতে চেয়েছে। আসলে মাকে বন্দনা করার কথা বিশেষ এক সম্প্রদায়ের কাছে হারাম, তাই সেকুলার সাজার মহৎ বাসনায় তাদের উচ্চারণের অযোগ্য কথা সংবাদ-মাধ্যমগুলির কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ রাজ্যের ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে ভারতবর্ষ মাতৃভূমি নয়, আরব তাদের পিতৃভূমি। এই সম্প্রদায়ও গত এক দশকে মূল ধারার সংবাদপত্র পরিচালনায় নাম লিখিয়েছে এবং এর পিছনে পেট্রো-ডলারের মদতও আজ প্রমাণিত সত্য। ফলে বোঝাই যাচ্ছে গণতন্ত্রের বিপদটা আজ ঠিক কোথায়।

শুধু বাণিজ্যিকীকরণের দোহাই দিয়ে সংবামাধ্যমের নৈতিক অবক্ষয় চাপা দিলে সেটা উটের বালিতে মুখ গুঁজে থাকার নামান্তর হবে। সমস্যা খুব গভীর, সমাধান অজানা। শুধু সচেতন থাকাটাই আপাতত প্রাথমিক কর্তব্য বলে বোধ হয়। ■

বাজার পত্রিকা

সিআরপি সুরক্ষায় বিমান ছিল না কেন
প্রশ্ন বাবলুর স্ত্রীর ৮

করিনার চরিত্র কী বার্তা দেবে?
আনন্দ প্লাস ১৫

১৪ ফাল্গুন ১৪২৫ বুধবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ · ৫ টাকা ১৮ পাতা

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ঘাত

টিতে ধ্বংস জঙ্গি ঘাঁটি

নিহত

ইউসুফ আজহার
মাসুদ আজহারের শ্যালক

মুফতি আজহার খান কাশ্মীরি
কাশ্মীরে জইশের মাথা

ইব্রাহিম আজহার
মাসুদ আজহারের দাদা

যে কোনও অবস্থার জন্য তৈরি ইমরান

ইসলামাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি: অধিবেশন শুরু হতেই স্লোগান উঠল পাক পার্লামেন্টে— “শরম করো, শরম করো/ইমরান খান শরম করো!” পাক মাটিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অভিযানের কয়েক ঘণ্টা পেরিয়েছে তখন। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যমের দাবি, ভারতকে ‘জবাব’ দেওয়ার দাবিতেই আজ পাক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে ‘লজ্জা হোক’ বলে এই স্লোগান তোলেন বিরোধীদের একাংশে।

চাপের মুখে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকে দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও জনতাকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পরে বিবৃতি দিয়ে ভারত সরকারের দিকে আঙুল তুলে সেই কমিটি বলেছে, “নির্বাচনের আবহে ঘরোয়া রাজনৈতিক স্বার্থে গোটা অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হল। ভারত অকারণ আগ্রাসন দেখিয়েছে। কখন এবং কোথায় এর জবাব দেওয়া হবে, তা পাকিস্তানই বেছে নেবে।” সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে পাক সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র আসিফ গফুরও বলেছেন, “এ বার আমাদের জবাবের অপেক্ষা করুক ভারত। কোথায়, কখন তা হবে, সেটা আমাদের অসামরিক নেতৃত্ব ঠিক করবেন। বলা ভাল, ঠিক করে ফেলেছেন।”

আজ ভোরে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে

■ইমরান খান। ফাইল চিত্র

জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে ভারতীয় বায়ুসেনার অভিযান এবং তাতে বহু হতাহতের খবর মানতে চায়নি পাক জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি। তাদের দাবি, “আত্মতুষ্টির জন্য আরও এক বার বেপরোয়া ও মনগড়া দাবি করছে ভারত সরকার।” আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে পাক সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, ঘটনাস্থলে এসে যাচাই করে যাক তারা। ভারতের কার্যনির্বাহী হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়ে ‘সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের’ প্রতিবাদও জানিয়েছে পাকিস্তান।

পরে অর্থ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি বলেন, “এটি নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘনের ঘটনা। আত্মরক্ষার্থে জবাব দেওয়ার অধিকার পাকিস্তানের আছে।” কুরেশির দাবি,

ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢোকার ‘বহুমুখী চেষ্টা’ চালিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাক যুদ্ধবিমানের তাড়া খেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। সকালে টুইটারে কিছু ছবি-সহ একই দাবি করেছিলেন সেনা মুখপাত্র গফুর। লিখেছিলেন, ‘তাড়াহুড়ো করে বোমা ফেলে গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। তাতে কেউ হতাহত হয়নি।’ সন্ধ্যায় তিনি বলেন, “২১ মিনিটের অভিযানের দাবি করছে ভারত। ২১ মিনিট কেউ পাকিস্তানের আকাশে থাকার চেষ্টা করে দেখাক।”

গফুরের দাবি, গত রাতে সিয়ালকোট এবং লাহৌর সীমান্তের কাছে প্রথম ভারতীয় বিমানের উপস্থিতি টের পেয়েই তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল পাক বায়ুসেনার কমব্যাট এয়ার পেট্রল (সিএপি) টিম। ভারতীয় বিমানগুলি তখন আর সীমান্ত পেরোয়নি। সেনা মুখপাত্রের কথায়, “এর পরেই সিএপি-র দ্বিতীয় দলটি আকাশে ওড়ে। তারা বাহাওয়ালপুর সেক্টরের কাছে আরও কয়েকটি ভারতীয় বিমানকে বাধা দেয়। তার পর দেখা যায়, কেরান উপত্যকা হয়ে মুজফফরাবাদের সেক্টরের দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় বিমানের একটি বড় ঝাঁক। সিএপি-র তৃতীয় দলটি চ্যালেঞ্জ করলেও তারা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরোয়। কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে যায় চার মিনিটের মধ্যেই।” গফুরের অভিযোগ,

With the Best Compliments

From :

VAIBHAV HEAVY VEHICLES

LTD.

চিঠিপত্র

নীরব মোদীর সঙ্গে অন্য মোদীর তুলনা ঠিক নয়

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী উত্তরাখণ্ডে জনসভায় বলেছেন— 'সব মোদী পদবিরাই চোর। যেমন, নীরব মোদী অপরাধী। প্রধানমন্ত্রী অপরাধ করলেও ছাড় পাওয়া উচিত নয়।' তবে সেটা মুখের কথা নয়, বাস্তবে প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু সব মোদী পদবিধারীই চোর— এই অন্যায় অপবাদের শাস্তি হওয়া উচিত। গান্ধী পরিবারের নেহরু থেকে রাহুল প্রত্যেকেই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। এখন তো মা-বেটা চুরির মামলায় জামিনে আছেন। কিন্তু ওদের অপকর্মের জন্য সমস্ত গান্ধী পদবিধারীদের চোর বলা যায় না। কারণ তা আইনত অপরাধী। তাই শুভমনস্ক মোদী বা মুদি পদবিধারীদের রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে সবক শেখানো উচিত।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলি।

সন্ত্রাসবাদ এবং ঘরশত্রুদের ভূমিকা

দেশের মধ্যে এত ঘরশত্রু আছে তা পুলওয়ামার ঘটনার পর দেশবাসী বেশি করে জানতে পারলেন। স্বাধীনতার ৭০ বছরের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে সুস্পষ্টনীতি নেওয়ার দায়িত্ব যাদের ছিল তারা অতি সম্প্রতি পুলোমায়ার জঙ্গি হামলার জন্য নরেন্দ্র মোদীর উপর খড়্গহস্ত। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, নরেন্দ্র মোদী যখন পুলওয়ামার বদলা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে জঙ্গিশিবিরের উপর 'এয়ার স্ট্রাইক' করে জঙ্গি ক্যাম্পগুলি গুড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন তখন দেশের বিরোধী দলের নেতারা এর পক্ষে প্রমাণ চাইলেন। এই যদি ভারতবর্ষের বিরোধদলের নেতাদের ভূমিকা হয় তাহলে পাকিস্তানের মতো একটা সন্ত্রাসবাদী দেশ ভারতকে বারবার সন্ত্রাসের ছোবল দিবার উৎসাহ পাবে বৈকি? একাজে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে তলে তলে এত ঘরশত্রু আছে তা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার সদর্থক দায়িত্বটা বিরোধীদল গুলির ভূমিকায় একটা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা ভুলে গেছি বহু রক্তপাত এবং বহু মানুষের জীবন বলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে আর এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান যে অন্যায় আবদার করে যাচ্ছে এবং নেহরুর ভুলের খেসারত ভারতবাসীকে আজ অবধি গুনে চলতে হচ্ছে।

আজকের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীর দল ভুলে গেছে দ্বিজাতি তত্ত্ব খাড়া করে যারা দেশটিকে খণ্ডিত করে ছেড়েছে তাদের বংশধররা এখানে এখনও সক্রিয়, সময়বুঝে স্বরূপ প্রকাশ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করবে না।

আজ যদি মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের সকল হিন্দু একজোট না হতে পারে তাহলে ভারতের অবশিষ্ট হিন্দু ঘোর অমানিশার ঘনঘটায় অচিরে গ্রাস হয়ে যাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

দেশ ত্যাগের কারণ

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় শ্রীচন্দন রায়ের 'কেন আমরা ভারত ভূমিতে এলাম' লেখাটি হৃদয় স্পর্শ করেছে। আজকাল বাজারি পত্র- পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে লাগাতার মিথ্যা কথার প্রচার শুনে রায়বাবুর সহজ সরল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য, তবে অসাধ্য নয়। আমার অবসর জীবনের ২৫ বছরের বেশি বাঙ্গলায় কেটেছে। এখন আমি অবসর নিয়ে জীবনের শেষদিকে যাওয়া শুরু করেছি। খুবই আনন্দ পাই দেশ এগিয়ে চলেছে দেখে। আর বামপন্থা ও অতি বাম যা এখন চলছে তা বন্ধ হওয়া উচিত। দেশ ত্যাগের কারণ হিসেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমানদের আগ্রাসনই প্রধান কারণ। বাংলাদেশে বারো ভূঁইয়ার দেশে ইশা খাঁ ছাড়া আর কোনো মুসলমান ভূঁইয়া ছিল না। যে ধর্ম অর্ধ অশিক্ষিত যা সন্তান প্রসবের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, সেখানে মানুষ হবে কেমন করে? বাকি বিশ্বের দিকে তাকান, আছে কোনো মুসলমান দেশ যেখানে মায়েরা সুশিক্ষিত সন্তান মানুষ করার যোগ্য? অথচ এ কথাটা আমরা বলি সব ধর্মের মধ্যে সত্য ও ভালোবাসা আছে। ডাহা মিথ্যা। ইসলাম ও খ্রিস্ট্রীয় ধর্মে তরবারি ও বন্দুকই প্রচারের মাধ্যম। তাই অচিরেই এই সব মতবাদ (ধর্মীয়) বিলীন হবে। সনাতন ধর্মই মানুষের একমাত্র পথ।

বাংলাদেশ ত্যাগের মূল কারণ অশিক্ষিত ও অমানুষিক মুসলমান। স্বাধীনতা পেয়ে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নেবে এই ভয়ে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা প্রথম দেশ ছাড়ে। ধনীরা তারপর। সর্বশেষে গরিব ও অল্প শিক্ষিত লোকেরা। শেষোক্ত লোকেরা সমাজের অগ্রবর্তী লোকেরা চলে আসায় আরও অসহায় বোধ করে। ভারত সরকার মুসলমান ও হিন্দু সবার জন্যেই দ্বার খুলে দেয় ভোটের জন্যে।

কংগ্রেস সরকার মনে করত ওরাই একমাত্র সরকার চালাবার অধিকারি। তাই দলদাস বেশি থাকলে ওদের আপত্তি নেই। এটাও দেশ ছাড়ার অন্যতম কারণ।

—অমৃতলাল দাস,
কসবা, কলকাতা-১০৭।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

আবিষ্কার

নবাঙ্কুর

ইশারায় কথা বলে একটা গোটা গ্রামের মানুষ

আগে শিশুশিক্ষা বইয়ে পড়ানো হতো 'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিবে না, বলিলে তাহারা মনে কষ্ট পায়।' ইন্দোনেশিয়ার একটি গ্রাম এই কথাটির একশো ভাগ পালন করে বিশ্বের মানুষের নজর কেড়েছে। উত্তর বালির গ্রামটির নাম বেংকালা। গ্রামে তিন হাজার মানুষের বাস। সকলেই ইশারায় কথা বলে। সবাই মুক ও বধির নয়। পঞ্চাশ জনের মতো মানুষ বোবা-কালা। ওরা যাতে বিব্রত বোধ না করে তাই গ্রামের সবাই ইশারায় কথা বলে।

হাতের সংকেতে, চোখের ইশারাতেই দিব্যি জমে ওঠে তাদের আড্ডা। বাজার, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ সব জায়গায় একই দৃশ্য। বালির এই গ্রামে সংকেতেই প্রকাশ পায় মানুষের মনের ভাষা। ইংরেজিতে এই গ্রামের নাম 'দ্য ভিলেজ অব ডেফ'। সারা গ্রামের মানুষ এই সাংকেতিক ভাষা জানে। গ্রামের মানুষের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকের দল। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রামের সকলেই কি মূক ও বধির? সাংবাকিরা গ্রামে গিয়ে চমকে ওঠেন। গ্রামের প্রবীণ মানুষটির নাম কোলোক। তাঁর ভাইপো উইংচু বলেন, তার কাকা মূক ও বধির। সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতে তুখোড়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কাকার কাছ থেকেই এই ভাষা শিখেছে। কাকা বোবা ও কালা হলে কী হবে, মার্শাল আর্টে চ্যাম্পিয়ন। এই বৃদ্ধ বয়সেও হাত দিয়ে নারকেল ভেঙে দু'ফাঁক করে দিতে পারেন। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা কাকার কাছে মার্শাল আর্ট শিখতে আসে। যারা আসে সবাই শিখে যায় ইশারার ভাষা। উইংচু নিজেও কথার চেয়ে ইশারায় ভাব প্রকাশ করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। সাংবাদিকদের তিনি বুঝিয়ে বলেন, গ্রামের সবাই আমাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী। আমরা তাদের প্রতিবন্ধী বলতে রাজি নই। তারা যাতে মনে কষ্ট না পায় তাই যারা কথা বলতে পারি তারাও ইশারায় কথা বলি। শিশু বয়স থেকেই ইশারার ভাষা শিখে ফেলার জন্য আগ্রহী থাকে প্রত্যেক মা-বাবা।

যেহেতু কোলোকই গ্রামের ইশারায় কথা বলার অগ্রণী মানুষ, তাই এই ভাষার নাম হয়েছে 'কাটা কোলোক'। স্থানীয় ভাষায় এর অর্থ হলো মূক ও বধিরদের ভাষা। জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা উত্তর বালির এই গ্রাম সারা বছর ধরে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র থাকে। পাথুরে জমিতে ছোটো ছোটো ঘর তৈরি করে বাস করে গ্রামবাসীরা। সকলেই চাষাবাদ ও পশু পালন করে। গ্রামের সবাই গরিব, কিন্তু সবার মুখে হাসিটুকু লেগে রয়েছে।

২০১০ সাল থেকে এই গ্রামের মোড়ল হিসেবে রয়েছেন ইদা মারদানা। তিনি বালিনিজ। ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। তিনি সাংবাদিকদের বলে দেন, বেংকালা গ্রামে শিশু জন্মের পর থেকে শেখানো হয় সাংকেতিক ভাষা। কারণ গ্রামের সকলের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইশারার ভাষা শেখাটা খুবই জরুরি। ইরা মারদানা নিজেও কাটা কোলোকে পারদর্শী। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে গ্রামে প্রতি পঞ্চাশ জনে একজন মূক ও বধির থাকলেও এখন সংখ্যাটা ক্রমেই বাড়ছে। বংশানুক্রমিক ভাবে প্রতি পরিবারে একজন করে বোবা-কালার জন্ম হচ্ছে।

এখানে স্কুলের পাঠ্যক্রমেও কাটা কোলোক রয়েছে। শিক্ষকরা যত্ন করে ছেলে-মেয়েদের এই ভাষা শেখান। সাংকেতিক ভাষায় গবেষণা করেছেন কেটু কান্টা। তিনি বলেন, স্কুলে এক হাজারের বেশি সাংকেতিক ভাষা শেখানো হয়। আর সব চাইতে আনন্দের বিষয়, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রকও কাটা কোলোক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দিব্যাঙ্গ জনদের সম্মান জানাতে একটা গোটা গ্রাম দিব্যাঙ্গ সেজেছে তা দেখার জন্য ভারত থেকে বহু মানুষ বেংকালা গ্রামে গিয়ে প্রেরণা নিয়ে আসছেন।

সোহম চৌধুরী

ভারতের পথে পথে

পালিতানা

অতীতে গুজরাটের পালিতানা গোহিল রাজপুত শাহজীর রাজধানী ছিল। ১৮২ ফুট উঁচু শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে পালিতানার মূল আকর্ষণ পাঁচ জৈন তীর্থের অন্যতম জৈন মন্দিরের। জীবনে একবার পালিতানায় আসা জৈন্যরা মহাপুণ্য বলে মনে করেন। একাদশ শতাব্দীর ৮৬৩ টি শ্বেতপাথরের মন্দির রয়েছে পাহাড় চুড়োয়। প্রথম জৈন্য তীর্থঙ্কর শ্রীআদিনাথ মন্দিরটি সেজন্য তীর্থযাত্রীদের কাছে পবিত্রতম। খুবই সুন্দর এর কারুকার্য। মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আদিশ্বর, আদিনাথ, বল্লভাই, মতিশাহ, কুমারপাল, রাজ , বিমল শাহ মন্দির। কার্তিক ও চৈত্র পূর্ণিমায় মহাধুমধাম সহকারে উৎসব হয় পালিতানায়। তখন সারা ভারতের জৈন্য সমাজের মানুষ ভিড় করেন পালিতানায়। শুধু মন্দির নয়, শত্রুঞ্জয় পাহাড় থেকে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর ও মনোরম। গুজরাটের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প রয়েছে এখানে।

জানো কি?

বিভিন্ন ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদক ও প্রকাশ কাল

- রাশিয়ান
  ইউ বালক্রুজেইদ, পুসহেসনিকভ, এ বুনিন, ১৯১৪
- চেক
  এফ ব্যালাজ, ১৯১৪
- স্প্যানিশ
  জেনোভিয়া কামব্রুবি দ্য জিমেনেজ ১৯১৯
- যুগোস্লাভ
  ডেভিস এস পিয়াদে, ১৯২৬
- এসটোনিয়ান
  হুগো ম্যাসিং, ১৯২৬

ভালো কথা

আবর্জনা দূর হঠাও

আমরা কয়েকজন বন্ধু সব সময় কিছু ভালো কাজ করার কথা ভাবতে থাকি। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় দিয়া বলল নববর্ষে তো পুরানো খারাপ সবকে বিদায় করতে হয়। সেই মতো তিনদিন আগে আমরা পাড়ার দশজন বন্ধু সারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে আবর্জনা সাফ করতে লাগলাম। আমরা ঝাঁটা আর ঝুড়ি নিয়ে কাজ করছিলাম। কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই পাড়ার ছোটো বড়ো এমনকী মেয়েরাও নেমে পড়লো। সকাল ন'টা থেকে বারোটা তিন ঘণ্টা ধরে সারা পাড়ার সব আবর্জনা এক জায়গায় করা হলো। তারপর গর্ত করে সেগুলি মাটিতে পুঁতে রাখা হলো। সারা পাড়া ঝকঝক করতে করতে লাগলো। সৌমেন কাকু চিৎকার করে সবার উদ্দেশে বলল, এবার থেকে আর কেউ আবর্জনা বাইরে ফেলবেন না। নিজের নিজের বাড়িতে গর্ত করে তাতে আবর্জনা পুঁতে রাখতে হবে। আমাদের স্লোগান হোক 'আবর্জনা দূর হঠাও'। গ্রামের সবাই তা মেনে নিল।

আনন্দ মাজী, দশম শ্রেণী, লখ্যাড়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) গ স ন জ যো

(২) শ প্র ব হি কা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) রা ন্ত চি ভা ক্রা ন্তা

(২) ড় ছা নি য়া সু বি

১ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) উচ্চশিক্ষিত (২) ইতিবাচক

১ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) অগৌরবজনক (২) অত্মীয়পরিজন

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসাতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (২) রীণা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।
(৩) আদৃতা দলই, সুতাহাটা, হলদিয়া, পূঃ মেদিনীপুর। (৪) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূঃ মেদিনীপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

হোমিওপ্যাথিতে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ক্যান্সার রোগটি সারা বিশ্বের সমস্যা। ক্যান্সার শব্দটি ল্যাটিন 'ক্যানক্রাম' থেকে এসেছে। 'ক্যানক্রাম' শব্দের অর্থ হলো কাঁকড়া। সে যেমন হাত পা চারিদিকে বিছিয়ে থাকে ঠিক তেমনি ক্যান্সার নামের রোগটি যে জায়গায় শুরু হয় তার চারপাশেই শুধু নয়, তার উৎপত্তির জায়গা থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। সে জন্যই এই রোগটিকে ক্যান্সার বলে।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন ওজন থাকে প্রায় পাঁচ পাউন্ড। উচ্চতায় প্রায় ফুট দেড়েক। কিন্তু যখন পরিণত বয়সে উপনীত হই তখন দেহের ওজন প্রায় শত পাউন্ড, উচ্চতা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ফুট— এটা কী করে সম্ভব হলো? সম্ভব হয়েছে দেহের কোষগুলোর বৃদ্ধির উপর শরীরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায়। শরীরের স্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির উপর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকত তা হলে তো আমরা দানবের চাইতেও বড়ো হয়ে যেতাম। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আসলে শরীরে কোষগুলো যখন নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে বাড়তে থাকে এবং শরীরের কোনও কাজেই আসে না, সেই কোষগুলোর সমষ্টিকে আমরা বলি টিউমার। টিউমারের ভিতরের কোষগুলোর চেহারা কখনও স্বাভাবিক কোষগুলোর মতো হতে পারে এবং চরিত্রের দিক থেকেও এই কোষগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নাও হতে পারে। এ ধরনের কোষ সমষ্টিকে আমরা বলি 'বিনাইন টিউমার। যখন ওই কোষগুলোর চেহারা শরীরের স্বাভাবিক কোষগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের হয় এবং কাজের দিক থেকেও শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হয়, তখন আমরা তাকে বলি 'ম্যালিগন্যান্ট টিউমার', যার সাধারণ নাম ক্যান্সার।

শতকরা ৯০ ভাগ ক্যান্সারের জন্য দায়ী আমাদের পরিবেশ আর আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা পদ্ধতি। আজ এ কথা প্রমাণিত যে, দেহের সমস্ত ক্যান্সারের প্রায় ত্রিশ ভাগের জন্যই দায়ী তামাক কিংবা ধূমপান। মদ্যপানের সঙ্গে মুখের ক্যান্সার জড়িত। তাছাড়া মদ্যপানের ফলে এক সময় লিভারের ক্যান্সারও হতে পারে। আজকাল কেউ কেউ মনে করেন, অল্প অল্প মদ্যপানে কোনও ক্ষতি নেই। গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে অল্পই হোক আর বেশিই হোক, মদ্যপান শরীরের কোনও না কোনও ক্ষতি করবেই। অন্য আর এক নেশার নাম পান। পানের সঙ্গে চুন মেশানো হয়— অনেক সময় সুগন্ধি জর্দাও। এই চুন এবং জর্দার সংমিশ্রণে পানপাতা চিবানোর ফলে মুখে এক ধরনের ঘায়ের সৃষ্টি হয়। সেই ঘা সহজে সারতে চায় না। এইভাবে কণ্ঠনালীর ক্যান্সার আত্মপ্রকাশ করে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে স্রেফ পান খেয়ে ভারতে ৩৫ শতাংশ মানুষ গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এছাড়াও মুখের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় শুধুমাত্র রাত-দিন পান চেবানোর জন্য। দাঁতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। দাঁত অকালে পড়ে যায়। পানের সঙ্গে থাকে আর একটি জিনিস, সেটি হলো সুপারি। এতে রয়েছে 'অ্যারোকোলিন' নামে একটি উপাদান। এটিও কোষের ক্ষতি করে। সুপরিতে থাকা ট্যানিক অ্যাসিড কোষের মধ্যস্থ জিনকে প্রভাবিত করে, ফলে শারীরিক বিকৃতি ও জটিল রোগ দেখা দেয়। বেশিরভাগ সুপারি লিভারের ক্যান্সারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। বাজারে বিক্রিত অধিকাংশ মিষ্টি সুপারি এক বিষাক্ত ছত্রাকে আক্রান্ত বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। পানে দেওয়া হয় খয়ের। খয়েরের প্রধান উপাদান ট্যানিন থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ু মুখের ক্যান্সার আজ স্তনের ক্যান্সারের জন্য খুব কম বয়সে অনেক সন্তান প্রসব, যোনিদ্বারের অপরিচ্ছন্নতা, আর একাধিক পুরুষের সঙ্গে দৈহিক মিলনই দায়ী। আর স্তনের ক্যান্সারের জন্য একটি কারণ হলো শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ানো। প্রাণীজ আমিষ ও প্রাণীজ তেল জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ এবং পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম না করাই অনেকখানি দায়ী।

হোমিওপ্যাথিতে ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব। চিকিৎসা মানে নিয়ন্ত্রণ, নিরাময় নয়। কারণ হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না, রোগীর চিকিৎসা করে। যাদের ক্যান্সার হয়েছে, তাদের নব প্রজন্মকে হোমিওপ্যাথি ধাতুগত চিকিৎসা করলে ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

যোগাযোগ : ৯৮৩০০২৩৪৮৭

डा. हेडगेवार
संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघ

With Best Compliments from :

Kotilya Consultants Limited

16-B, Shakespeare Sarani
B. K. Market, 1st Floor, Kolkata - 700 071

মমতার স্পিডব্রেকার ব্যর্থ শিলিগুড়িতে জনসুনামি

সাধন কুমার পাল

সংখ্যাতত্ত্বে না গিয়ে এক কথায় বলা যায় গত ৩ এপ্রিল শিলিগুড়ির কাউয়াখালির ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভায় জনসুনামি আছড়ে পড়েছিল। অনেকেই বলছেন উচ্ছ্বাসে ও জনসমাগমে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ছাপিয়ে গেছে এই নির্বাচনী সভা। চূড়াভাণ্ডারে সভায় যাতে মানুষ আসতে না পারে তার জন্য সে সময় তৃণমূল ও প্রশাসন বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। গাড়ির মালিক, কর্মচারী থেকে শুরু করে আমজনতা সবাইকে মোদীর সভায় গেলে ভয়ংকর পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, মারধর করা হয়েছে। এবার কাউয়াখালির সভায় জনসুনামি রুখে মাস্টার স্ট্রোক দিতে তৃণমূল নেত্রী স্বয়ং হাজির হয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে। একই দিনে কোচবিহারের দিনহাটায় আয়োজন করেছিলেন নির্বাচনী জনসভার। মানুষের সমর্থন কার দিকে এটা প্রমাণ করে দেবেন বলে আগে থেকেই হুংকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু জনসভার দিন দেখা গেল ভিড় তো দূরের কথা, দলের সুপ্রিমোর উপস্থিতিতে তৃণমূলের পতাকাবাহী দুষ্কৃতীরা ভয় দেখিয়ে টাকা ছড়িয়েও মাঠ ভরাতে ব্যর্থ হলো। মাঠ ফাঁকা থাকার জন্য কোন কোন নেতার গর্দান যাবে সেটা দলের অন্দরমহলের লোকেরাই বলতে পারবে। তবে সভায় উপস্থিত মানুষ ও মিডিয়ায় যারা চোখ রেখেছেন তারা দেখছেন এদিন মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে নেত্রী এদিন গলার শিরা ফুলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ডুপাত করেছেন। অনেকেই বলছেন তৃণমূল নেত্রীর এদিনের ভাষণ কুকথার সেরা সংগ্রহ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীর কাউয়াখালি নির্বাচনী জনসভায়। একদিকে ভিড়ের চাপে হাজার হাজার মানুষ ঢুকতে পারছে না, অন্যদিকে জল কম থাকায় মানুষ হেঁটে মহানন্দা পার হয়ে সভাস্থলে ঢুকছে। এক কথায় সভায় হাজির হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য মানুষের উন্মাদনা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার। 'মোদী মোদী' রবে সভাস্থল মুখরিত হয়েছে বারে বারে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজু আমাদের ঘরের ছেলে, আমার সঙ্গে ওর বহুদিনের সম্পর্ক। ওকে ভোট দিন। সারা বছর রাজু আপনাদের সঙ্গে থাকবে, আপনাদের কথা শুনবে'।

প্রধানমন্ত্রী বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই রাজ্যে উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হয়েছে। নেত্রীর সঙ্কীর্ণ রাজনীতির কারণে রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে রয়েছে স্পিডব্রেকারের জন্য। রাজ্যবাসী যাকে দিদি বলে জানে তিনি আসলে স্পিডব্রেকার দিদি, কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে দেন না, সমস্ত কাজেই বাধা দেন। তাই স্পিডব্রেকার দিদিকে সরাতে হবে।

চিটফান্ডের মাধ্যমে আমজনতার টাকা লুট করা হয়েছে। দিদির দলের নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী, বিধায়করা গরিবের টাকা লুটেছেন।

গরিব সাধারণ মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের মানুষ এই প্রকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়ে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু স্পিডব্রেকার দিদি ব্রেক লাগিয়ে দিয়ে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে রাজ্যে ঢুকতে দিচ্ছেন না।

৪০ লক্ষেরও বেশি কৃষকের প্রাপ্য আটকে দিয়েছেন দিদি। কৃষক সম্মান যোজনায় ব্রেক লাগিয়ে সরাসরি রাজ্যের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছতে দেননি স্পিডব্রেকার দিদি।

দেশের প্রতিটি গ্রামে স্বচ্ছ ভারত যোজনার মাধ্যমে গরিব মানুষ শৌচালয় পেয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ গ্যাসের কানেকশন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প গুলিতে আরও মানুষ উপকৃত হতো কিন্তু দিদির বাধায় তা হয়নি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখানে এশিয়ান হাইওয়ে হয়েছে। রোড কানেকটিভিটি বেড়েছে। নতুন নতুন ট্রেন চালানো হয়েছে। জলপাইগুড়িতে সার্কিটবেঞ্চ চালু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জনজাতির উন্নয়নে নজর দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ভাবে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে। কোচ, রাজবংশী, জনজাতিদের উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোর্খা ভাই-বোনদের আশ্বস্ত করছি এনআরসির জন্য আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে না। আগে বামেরা যা করত, এখন দিদি তাই করছেন। বাম-কংগ্রেস- তৃণমূল একই থালায় খাচ্ছে। তৃণমূলে থেকে যারা ভয় দেখাচ্ছে, তাদের বলছি দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য আমাদের সরকার অনেক কাজ করেছে। অসমে আমাদের সরকার রয়েছে বলে চা-শ্রমিকরা উপকৃত।

এই রাজ্যে জগাই-মাধাইয়ের দিন খতম হচ্ছে। এই বার আর কেউ ভোট আটকাতে পারবে না। স্পিডব্রেকার দিদি এর জবাব পাবে।

পুলওয়ামার বদলা বালাকোটে নিয়েছি। ঘরে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের মেরেছি। দেশবাসীর গর্ব হয়েছে। দিদির কান্না বেড়েছে। ইসলামাবাদ রাওয়ালপিন্ডির থেকে কলকাতার দিদির বেশি কষ্ট হয়েছে।

কংগ্রেস সেনাদের বিশ্বাস করে না। তাই বদলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বীর জওয়ানদের পরিবর্তে উপত্যকায় যারা পাথর ছুঁড়ছে তাদের হিরো বানাচ্ছে। ■

সিংহের গর্জনে

চন্দ্রভানু ঘোষাল

নরেন্দ্র মোদী এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। সেই সঙ্গে বার্তা দিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল -সিপিএম-কংগ্রেসের দিন শেষ। পরিবর্তন আসন্ন। ব্রিগেডে মানুষের ঢল দেখে তাঁর সহাস্য মন্তব্য, 'বেশ বুঝতে পারছি দিদির রাতের ঘুম উবে গেছে।'

বস্তুত, নরেন্দ্র মোদীর ৩ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়, লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি। স্মরণযোগ্য কালে এমন বিপুল জনসমাগম ব্রিগেডে দেখা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুচর্চিত 'মহাগঠবন্ধনের' সভাতেও এমন উপচে পড়া ভিড় ছিল না। চৈত্রের প্রচণ্ড গরমে যাতে কারোও কষ্ট না হয় তার জন্য রাজ্য বিজেপি মাথার ওপর অস্থায়ী ছাদের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ভিড় বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ছাদের নীচে সকলের স্থান-সংকুলান অসম্ভব হয়ে ওঠে। বহু মানুষ রোদে দাঁড়িয়ে প্রিয় নেতার ভাষণ শুনতে থাকেন। যা দেখে অভিভূত নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'বাঙ্গলার মানুষ এত ভালোবাসা দেবে ভাবিনি। আমি আপনাদের সবাইকে প্রণাম করছি।'

একদিকে বাঙ্গলা মিডিয়ার লাগাতার নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা আর অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদাগিরি— এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে ব্রিগেডের জনসভার ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সভা আদৌ হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তাই নিয়েও। নেতিবাচক পরিস্থিতিতে কঠিন লড়াই করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে সভার আয়োজন করেছেন তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, এরপর তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তা চূড়ান্ত বোকামি হবে।

ক্ষমতায় ফিরলে তাঁর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে, এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বাঙ্গলার মানুষের অনেকদিনের দাবি, সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িত তৃণমূলের নেতাদের কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না কিংবা, ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে যে নেতা-মন্ত্রীদের ঘুষ নিতে দেখা গেছে তারা কেন জেলের বাইরে রয়েছেন— এদিন মোদী তার জবাব দেন। তিনি বলেন, '২০১৪ সালে আপনাদের ভোটের জন্য প্রতারকেরা জেলের দরজায় পৌঁছেছে, এবার ভোট দিলে তারা

উত্তাল ব্রিগেড

জেলে যাবে।' একথা শুনে হাততালিতে ফেটে পড়ে জনতা।

বালাকোটে ভারতের এয়ার সার্জিকাল স্ট্রাইকের বিরোধিতা করার জন্য এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন নরেন্দ্র মোদী। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'চোট পাকিস্তানের লেগেছে কিন্তু ব্যথা পাচ্ছেন দিদি। বলছেন, মোদী প্রমাণ দিন। জঙ্গিদের সঙ্গে এরকম করা উচিত নয়। ভারতের সেনাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তাতে আপনারা খুশি কিন্তু দিদি নন। দিদি এত বেশি কেঁদেছেন সে পাকিস্তানে নায়িকা হয়ে গেছেন।' নরেন্দ্র মোদী জনতার কাছে জানতে চান, 'প্রমাণ চাওয়ার পাপ কে করেছিল? শহিদ সুদীপ বিশ্বাস আর বাবলু সাঁতরার অপমান নয় এটা?'

চল্লিশ মিনিটের ভাষণে সিংহের গর্জন শুনেছে পশ্চিমবঙ্গ। উত্তাল হয়ে উঠেছে জনতা। ঢাকা পড়ে গেছে দিনহাটায় মমতার সভা। ব্রিগেডে জনপ্লাবন দেখে নিঃশব্দে ভোল পালটে ফেলেছে বাঙ্গলা মিডিয়াও। মমতার তাঁবেদার এবিপি আনন্দ এদিন মোদীর সভাকে বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়। দিনহাটায় মমতার সভার সম্প্রসারণ করা হয়েছে বটে কিন্তু চ্যানেলের বিশেষ নজর ছিল মোদীর সভায়। আনন্দবাজারের শিরোনাম অনুযায়ী মোদীর 'দুপুরের সভার জবাব বিকেলে' দিতে গিয়ে মমতা আগেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলেন, সভায় তার দলতন্ত্রের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারা এবং মুখে, 'আগে দিল্লি সামলা পরে দেখিস বাংলা'— স্লোগান মোদীর পাশে তাকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে।

মানুষটাকে চোখের দেখা দেখতে এসেছি : রফিকুল ইসলাম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলেন। নরেন্দ্র মোদীকে বলেন দাঙ্গাবাজ। কিন্তু রফিকুল ইসলাম বলেন না। বিশ্বাসও করেন না। ব্রিগেডের সভায় এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে। মাথায় চৌকিদার লেখা গেরুয়া রঙের টুপি। নরেন্দ্র মোদীকে কেমন লাগল প্রশ্ন করায় বলেন, 'দেখুন আমরা গ্রামের মানুষ। আমাদের চাহিদা বেশি নয়। নিত্যদিনের সামান্য ইচ্ছে পূরণ হলেই আমরা খুশি। ভরতুকিতে গ্যাস পেয়েছি, মুদ্রা যোজনার সুবিধাও পাচ্ছি। এগুলো আমাদের মতো গরিব মানুষের কাছে অনেক বড়ো ব্যাপার। তাই মানুষটাকে চোখের দেখা দেখব বলে এসেছি।'

ওড়িশায় পরিবারতন্ত্র উপড়ে ফেলার ডাক মোদীর

অশোক মাইতি

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিজেপি ততই আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে। গত ৬ এপ্রিল ওড়িশার সুন্দরগড় এবং সোনেপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুটি বিশাল জনসভা করেছেন। সেখানে নববাত্রির আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ''আজ একটি বিশেষ দিন। কারণ আজ বিজেপির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আমাদের দল সাধারণ মানুষের ইচ্ছে ও আবেগের পুঁজিতে তৈরি হয়েছে এবং এখনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে কার্যকর্তাদের কঠিন পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করে। আমাদের দলে অর্থ এবং পরিবারের কোনও ভূমিকা নেই।''

তরুণ প্রজন্মের যে-সৃজনশীল মনন থেকে একবিংশ শতকের 'নতুন ভারত'-ভাবনার জন্ম তার ব্যাখ্যা করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমাদের দলের লক্ষ্য, সব কা সাথ সব কা বিকাশ। এরকম একটা লক্ষ্য স্থির করার কারণ কী? যাতে সবাই সমান সুযোগ পায় এবং উন্নতি করে। সব সরকারেরই এরকম একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। কোনও দেশই এখন মানুষের মধ্যে ধর্ম জাতপাত এবং ভৌগোলিক কারণে বিভেদ সৃষ্টি করার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। আমাদের স্বপ্নের নতুন ভারত যে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে শুধু তাই নয়, তার ওপর নেমে আসা প্রতিটি আক্রমণকেও সে প্রতিহত করছে। সকলেই জানেন, এই ভারত তার শত্রুদের উচিত শিক্ষা দেয় এবং ভবিষ্যতেও দেবে। কয়েক দশক ধরে বিজু জনতা দলের সরকার ওড়িশায় ক্ষমতাসীন। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ। এটা স্পষ্ট, মানুষ এখন পরিবর্তন চান। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, স্রেফ ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি এ রাজ্যে উপেক্ষিত। আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্প, যার মাধ্যমে গরিব মানুষ চিকিৎসার দরুন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন, ওড়িশায় বারে বারে উপেক্ষিত হয়েছে। একই কথা বলা চলে কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহায়ক মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রেও।'

কংগ্রেস বিজেডি তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি পরিবারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। এই মারাত্মক প্রবণতা যে কোনও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাই ওড়িশা-সহ সমগ্র দেশ থেকে পরিবারতন্ত্র উপড়ে ফেলার ডাক দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'কংগ্রেস এবং বিজেডির কাছে গরিব মানুষ মানে শুধু ভোটব্যাঙ্ক। গরিব যদি চিরকাল গরিব থাকে তাহলে তাদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে। ওড়িশার মতো একটি কৃষ্টিসম্পন্ন রাজ্য এই কারণেই আজও উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস চিরকাল উন্নয়নের প্রশ্নে দেশের একটি নির্দিষ্ট অংশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বাকি অংশ থেকে গেছে অন্ধকারে। পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চলই হয়ে উঠেছে নকশাল এবং মাওবাদীদের দুর্গ। ভোট এলেই কংগ্রেসের নেতারা গরিবি হটানোর লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করেন না। তাই, ওড়িশা তো বটেই, সেই সঙ্গে অন্য রাজ্যের মানুষও এখন আর কংগ্রেসের নেতাদের কথায় বিশ্বাস করেন না।'

গত ৭ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে জনসভা করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত মানুষকে ধন্যবাদ জানান। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে-কদর্য ভাষা ও ভঙ্গিতে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আসলে দিদি ভয় পেয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সেই জনসমর্থন আর নেই। তাঁর সুবিধাবাদী রাজনীতি ক্রমেই পশ্চিমবঙ্গে জমি হারাচ্ছে। সেই কারণেই তিনি আমাকে রকের ভাষায় গালিগালাজ করেন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পিডব্রেকার আখ্যা দিয়েছিলেন আগেই। এদিনও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, 'দিদির জন্যই পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন ঠিকমতো হচ্ছে না।'

এবারের নির্বাচনে বিজেপি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের রাজ্যগুলির ওপর। সেই তালিকায় ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে প্রথম সারিতে। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে এই দুই রাজ্যে নরেন্দ্র মোদীকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ততই বাড়ছে। কাতারে কাতারে মানুষ আসছেন নরেন্দ্র মোদীর জনসভায়। তাঁকে দেখতে। তাঁর কথা শুনতে। পশ্চিমবঙ্গ আর ওড়িশা যে এবার বিজেপিকে নিরাশ করবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। ■

কোচবিহারে মোদীর জনসমাবেশের একাংশ।

সাক্ষাৎকার

হিন্দু বিরোধীদের সর্বশক্তি দিয়ে পরাজিত করতে হবে : স্বামী অসীমানন্দ

সম্প্রতি সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ মুক্তি পেয়েছেন। মুক্তি লাভের এক-দুদিন পরই তিনি তাঁর মায়ের আশীর্বাদ লাভের জন্য কামারপুকুরে এসেছিলেন। সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে একমাত্র স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন।

❑ যেসব অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, প্রায় সাত বছর পর দেশের আদালত তা থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়েছেন। মুক্তি লাভ করে আপনার কেমন লাগছে?

● শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হলো। তাই সঙ্গত কারণেই আনন্দ বোধ করছি। আমাদের জাতীয় আপ্তবাক্যও 'সত্যমেব জয়তে'। এই মুক্তি লাভে সমগ্র জাতিও তাই খুশি।

❑ এতদিন কারাবন্দি থাকার সময় যেসব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল সেই বিষয়ে যদি কিছু বলেন—

● সেইসব প্রসঙ্গ না বলাই ভালো। তবে এক কথায় তা অসহনীয়।

❑ 'হিন্দু সন্ত্রাস' বিষয়ে আপনি কী বলেন?

● ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে এই শব্দের সৃষ্টি। হিন্দু শক্তিকে দমন করবার জন্য হিন্দু সন্ত্রাস শব্দটি হিন্দু বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের ফসল। হিন্দুরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এমন কোনও নজির ইতিহাসে নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বলেছেন, গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে হিন্দুরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এমন কোনও নজির কেউ দেখাতে পারবেন না।

❑ আপনাকে গ্রেপ্তারের পেছনে 'ঘরওয়াপসি' (ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা) আন্দোলন বলে অনেকে মনে করছেন। আপনি কী বলেন?

● হিন্দু শক্তিকে দমন করার বিষয়ে সবাই এক। তা সে মুসলমান- খ্রিস্টান-কংগ্রেস-কমিউনিস্ট যেই হোক না কেন। এ বিষয়ে তারা এককাট্টা। 'ঘরওয়াপসি' আন্দোলন তাদের ষড়যন্ত্রের মূলেই আঘাত করেছে। তাই এই আন্দোলনে যাদের সক্রিয় ভূমিকা, তাদেরই বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়েছে

❑ এখন কি আপনি আগের মতোই এ ব্যাপারে সক্রিয় থাকবেন?

● যে কাজ গোড়া থেকেই করে চলেছি, এখনও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। হিন্দু সমাজের সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

❑ শোনা যাচ্ছে, আপনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন?

● এ ধরনের কোনও খবর জানি না।

❑ আপনি কি ভারতীয় সন্ন্যাস পরম্পরা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করবেন?

● সন্ন্যাস গ্রহণের পর বরাবরই সন্ন্যাস জীবন-যাপন করছি। মানুষের মঙ্গলই আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য। মানুষের সেবাই সন্ন্যাসীর কাজ। তাই আধ্যাত্মিক জীবনই সন্ন্যাসীর জীবন। সন্ন্যাসী আছি এবং থাকবও।

❑ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে কিছু বলবেন?

● হিন্দুবিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করার একটা সুযোগ এই নির্বাচন নিয়ে এসেছে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে এই নির্বাচনে হিন্দু শক্তিকে বিজয়ী করতে হবে।

❑ এত ব্যস্ততার মধ্যে শুধু আমাদেরই এরকম সাক্ষাৎকার দিলেন। পত্রিকার তরফে এজন্য আপনাকে অভিনন্দন।

● ধন্যবাদ।

মুক্তির পর মায়ের আশীর্বাদ নিচ্ছেন স্বামী অসীমানন্দ।

ড. মনিমোহন ভট্টাচার্য
স্বামীজী পুত্র নেতাজী
(১ম খণ্ড) ₹ ৩৫০
(২য় খণ্ড) ₹ ৩৫০

দেবীপ্রসাদ রায়
প্রসঙ্গতঃ মানবেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়)
₹ ২০০

ড. সিসিলা দে সরকার (বসু)
কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু
₹ ২৫০

সুনীল দাস
চারটি রহস্য উপন্যাস
₹ ২০০

প্রদীপ ঘোষ
লোকসংস্কৃতির বিপন্নতা ও অন্যান্য
₹ ১৫০

হরিবংশ রাই বচ্চন
অনুবাদ : সুমিতা ভৌমিক
মধুশালা
₹ ১০০

নির্মল ঘোষ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংশয়ে ও স্বপ্নে
₹ ১৫০

আহমদ রফিক
জাতিসত্তার আত্মঅন্বেষা বাঙালী ও বাঙলাদেশী
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ণ
(১ম খণ্ড) ₹ ২৫০

আহমদ রফিক
এই অস্থির সময়
₹ ১৭৫

পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য
মন ক্যামেরা
₹ ২০০

শেখর সেনগুপ্ত
পঞ্চ ঋষির রমণীচক্র
₹ ২৫০

Dr. Subhrendu Bhattacharjya
Affinity between Blake's Views And Indian Philosophy
INR : 500

ড. বিজয় আঢ্য
পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে
₹ ২০০

বিপ্লব মজুমদারের
রণিদা রহস্য ট্রিলজি
₹ ২৫০

সৌরকুমার বসু
শান্তিনিকেতন ও নকশাল আন্দোলন
₹ ২০০

সাতটি রহস্য উপন্যাস
₹ ৩৫০

কথামৃতসার
(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সংকলক জীবনীকার
মণি বাগচি
₹ ২০০

সিদ্ধার্থ সিংহ
নামগোত্রহীন
₹ ৩৫০

মুকুল গুহ
খর্সাং পাহাড়ের রহস্যটিলা
₹ ২৭৫

Anjusri Chandra
Roaming from Place to Place Country to Country
₹ ২০০

প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ • ফোন : ২২৪১ ২১০৯, ৬৪৫৪-২১০৯
email : publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

নববর্ষের সম্ভাষণ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

নববর্ষের নির্বাচন

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ‘নববর্ষে’ কবিতায় লিখছেন, ‘সমীর শিহরে; বিহগ কুহরে;/তটিনী সুধীরে পড়িছে লুটে।/আকাশের ভালে মেঘের আড়ালে/সোনামুখী ঊষা উঠিছে ফুটে।” বলছেন, কুসুম-সাজে সেজেছে ধরণী; চারিদিকে গান, হাসি, কাছে আসা-আসি; বর্ষ ঘুরে যায়, ধরা ঘুরে আসে— কিন্তু তার হৃদয় কি ঘুরবে না? প্রকৃতপক্ষে নববর্ষের কাছে মানুষের অসীম আশা। মানুষ নববর্ষকে কেন্দ্র করেই উজ্জীবিত হতে চায়; নববর্ষ নামক এক বৎসর-সন্ধিক্ষণে মানুষ তার মনোবীণায় বাঁধতে চায়। নতুন তার। কিন্তু নববর্ষ তো আর অতীতকে অপনোদন করে নয়। অতীত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধারাবাহিকতা নিয়েই তো বর্ষবরণ! মধুসূদন যতই লিখুন, ‘ভূত-রূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর’। মন মানে না, কারণ অতীত দিনের ভুলের ফর্দ যে আমাদের কুরে কুরে খায়! এখনও যদি অতীতচারী না হই; নিজের, সমাজের, রাষ্ট্রের কৃতকর্মের অন্যায়গুলি সংশোধন না করি তবে আগামীর নববর্ষ আমাদের ক্ষমা করবে না। সমৃদ্ধিশালী ভারত, কুশল-রাজ্য যদি নির্মাণ করতে হয় তবে অতীত-চারণ করতেই হবে। নববর্ষের আনন্দবার্তার মাঝে তাই ফেলে আসা দিনগুলির ভুল স্বীকার করে নিজের সজাগ মতদান করতে হবে। এই নববর্ষ তাই আগামীর নির্বাচনে যেন ত্রুটি অপনোদনের যথার্থ মরশুম হয়ে ওঠে। অবশ্য পূর্বের আনন্দ-রসও যেন ঢেলে নিতে পারি নতুন পাত্রে— ‘‘কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে/তাদের কাছে নিস গো ভরে/ওই বছরের শেষের মধু/এই বছরের মৌচাকেতে।” বাংলায় যতটুকু আলো এখানো আছে তা নিবে গিয়ে অন্ধকারে বাঙ্গালির গৃহ আবৃত হবার আগেই সেই বাতিতে নতুন তৈল ও উসকো কাঠি দিয়ে আলোকিত করার নামই হোক নববর্ষ। বাঙ্গালির বর্ষপঞ্জিতে সনাতনী-সংস্কৃতির মেলবন্ধনের দিন হয়ে উঠুক বর্ষবরণ, হিন্দুমিলন মঞ্চ।

হে নূতন দেখা দিক আরবার

সনাতন ভারতবর্ষের বিরোধী একটি জগদ্দল পাথর ৩৪ বছর বাঙ্গালাকে করেছিল ভারত-বিমুখ; ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অচ্ছেদ্য অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ— ভুলে গিয়েছিল বাঙ্গালি। শুরুটা আগেই হয়েছিল, যখন বাঙ্গালি-সম্ভূত ‘ভারত-কেশরী’-কে মারা হয়েছিল কাশ্মীরের বধ্যভূমে। বাঙ্গলা, ত্রিপুরার বাঙ্গালি ভারতমুখী না হয়ে হয়েছিল রাশিয়া আর চীনের অভিমুখী। যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বাঙ্গালিকে দেখানো হয়েছিল তার চাইতে ঢের চিরায়ত সমাজ-চেতনা ও তার অঙ্কুর ভারতবর্ষেই ছিল মজবুত— শ্রীচৈতন্য, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন ও সাম্যবাদের ধারণা এক চিরায়ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ক্ষেত্রও ছিল প্রস্তুত। কিন্তু মগজ তাদের ভারতে ছিল না। ভল্গার জলে ধোলাই হয়ে গিয়েছিল। তারপর হোয়াং-হো নদীতে ধুয়ে গেল ভারতবোধ। গবেষণা হওয়া দরকার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (বিবেকানন্দবাদী) কেন প্রতিষ্ঠা হলো না ভারতে, গবেষণা হওয়া দরকার সাম্যবাদী দলের সরকারি ধর্ম কি হিন্দু-বিদ্বেষী কোনো ধর্ম? যে সমাজ-সংস্কৃতির অন্দরেই শতশত ভারতীয় মনীষার প্রার্থনা ছিল দুর্বলতা মোচনের, অজ্ঞতা অপনোদনের, প্রার্থনা অন্তেবাসীর আলোকায়নে, আত্মোপলব্ধিতে, সর্বভূতে দেবোপম সম্ভাবনাকে চিনে নেবার সেখানে শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ

পরম্পরা

দিয়ে ভারতবর্ষীয় সমাজতন্ত্রের ভাবনার গোড়াতেই ছিল ভুল। সমাজতান্ত্রিকরা বুঝতে পারেননি ধর্ম হচ্ছে ভারতবর্ষের আত্মা, মেরুদণ্ড, জীবনকাঠি। তারা ভারতবর্ষের সনাতনী-সভ্যতা ধ্বংস করার জন্যই বিদেশি তত্ত্ব খাড়া করেছিল এবং তাতে ছদ্মবেশী লিবারেল, হিন্দুবিদ্বেষীরা সঙ্গত করেছিল সাম্রাজ্য বিস্তার করার ব্লু-প্রিন্টে। আজ যখন আপন কৃতকর্মে তারা অপ্রাসঙ্গিক, অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার ব্যতিরেকে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল— আগাছা অপনোদন করার এক যোগ্যতম নববর্ষ হচ্ছে ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে শুভঙ্করী ধর্ম থেকে পৃথক করা

মানেই ভারত রাষ্ট্রকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, যার অন্তর্জলি যাত্রা বিগত ৭০ বছর ধরে দেখা গিয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে এক নতুন চিকিৎসক ভারতভূমে আপন সৌকর্যে আবির্ভূত, যার একহাতে বৈরাগ্য আর হাতে বিজ্ঞান; সেই সব্যসাচীই পারেন ভারতভূমিকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে, বাঙ্গলা যাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাতে তালে মিলিয়ে চলতে পারে নববর্ষের কাছে এটাই প্রত্যাশা।

নববর্ষ ভাবনা

বাঙ্গলা ক্যালেন্ডারে নববর্ষ হলো পয়লা বৈশাখ। বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আগমনেই আসে বৈশাখ আর সেটা চৈত্রের চিতাভস্ম উড়িয়ে। এই নববর্ষে সব অর্থেই পরিবর্তন চাই। বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্তন, রূপবৈচিত্র্যের পরিবর্তন, চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, সেই সঙ্গে বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিবর্তন। ‘শুকনো গাঙ্গে আসুক জীবনের বন্যা’; ভেসে যাক জীর্ণ পুরাতন; বাঙ্গলার গ্রাম-জনপদ থেকে বারুদের গন্ধ মুছে যাক; গত গ্রীষ্মে পুরুলিয়া-বীরভূম-সহ সারা বাঙ্গলায় ‘মধ্যদিনের রক্ত নয়ন’ যারা দেখিয়েছে তাদের পরিবর্তন হোক ১৪২৬ বঙ্গাব্দে।■

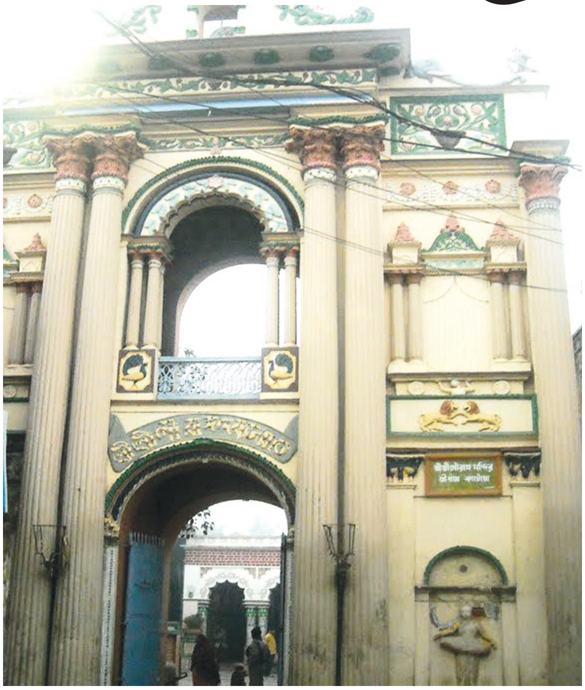

কাটোয়া গৌরাঙ্গ মন্দিরের প্রাচীন সেবাইতের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার

সমীর চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় ২৫-২৬ বছর আগেরকার কথা। যখন আমি নিত্যযাত্রী হিসাবে বর্ধমান যাতায়াত করতাম ছোটোলাইনের ট্রেনে. তখন আলাপ হয় গার্ড সাহেব সরকারবাবুর সঙ্গে। পুরাতন দিনের মূল্যবোধযুক্ত লোক হওয়ায় নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম তাঁর সঙ্গে। তিনি একদিন আমাকে একটি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর গুরুদেব কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়ায় থাকেন। নাম শ্রীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে। যাঁকে আমি পাড়াসূত্রে শ্রীমোহন কাকা বলে ডাকতাম এবং আমরা উভয়েই কাটোয়া গৌরাঙ্গ মন্দির সেবায়েত পরিবারের সন্তান। পরের দিন আমি গেলাম শ্রীমোহনকাকার বাড়ি, মণ্ডলপাড়ায় গুণেন্দ্রনাথ পার্কের কাছে। শ্রীমোহনকাকাকে তাঁর শিষ্যের দেওয়া চিঠি দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ অর্থাৎ কাটোয়ার সুপ্রাচীন গৌরাঙ্গবাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, যেখানে শ্রীমোহনকাকা নিত্য আহ্নিক ও মালা জপ করতেন, সেখানে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের ছবি রয়েছে। শ্রীমোহনকাকাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন যে, ইনি অতি প্রাচীন সেবায়েত। নাম শ্রীগৌড় শিরোমণি। তিনি সে সময়ে বিখ্যাত ভগবত পাঠক ছিলেন এবং এ স্থানে অর্থাৎ বর্তমান সেবায়েতরা যে এলাকার মধ্যে বাস করে, সে স্থানে বাস করতে থাকেন এবং তোমাদের যে বাড়ি অর্থাৎ আমার পৈতৃক বাড়ি, তার অর্ধেকটাই ছিল তাঁর ভদ্রাসন।

এই গৌড় শিরোমণি মহাশয়ের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম রাসবল্লভ মুখোপাধ্যায় (ভগবত ভূষণ), আর একজনের নাম শ্রীবৈষ্ণবচরণ মুখোপাধ্যায়। শেষ বয়সে গৌড় শিরোমণি মহাশয় দেববিগ্রহের সেবা পূজার ভার পুত্রদের হাতে দিয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং বাকি জীবন বৃন্দাবনে ধর্ম-কর্ম এবং ভাগবত পাঠে অতিবাহিত করে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সমাধি আজও বৃন্দাবনে কেশীঘাটে রয়েছে। এর বড়ো পুত্র রাসবল্লভ মুখোপাধ্যায়ও খুব পণ্ডিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তদানীন্তনকালে ভাগবত পাঠক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আদি সেবায়িত যদুনন্দন চক্রবর্তীর বড়ো পুত্রের বংশধর শ্রীকৃষ্ণলাল ঠাকুরও একজন ভাগবতের কথক ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত ললিতমোহন ঠাকুর নবদ্বীপে টোল খুলে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তাঁদের বংশধর ছিলেন বামনদাস ঠাকুর। যিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে মহাপ্রভু বিগ্রহের সম্মুখে হরিনাম সংকীর্তন করতেন। তখন কিন্তু এখনকার মতো চার থামযুক্ত নাটমন্দির ছিল না। ছোটোবেলায় হরিনামের আসরে শ্রীমোহনকাকাও থাকতেন। শ্রীমোহনকাকা বামনদাসবাবুকে কাকা বলে ডাকতেন। তাঁর হরিনাম সংকীর্তনের আকর্ষণ এমনই ছিল যে, তখনকার কাটোয়ার সব লোক প্রতি সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গ বাড়িতে ভিড় করত।

শ্রীমোহনকাকা বছর দশেক আগেও বেঁচেছিলেন এবং তাঁর অপূর্ব হরিনাম সংকীর্তন অনেকেই শুনেছেন। যার জন্য আজও দেখতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমোহনকাকা বেঁচে না থাকতেও তাঁর সেবার দিন অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়। যার বেশিরভাগই ছিল শ্রীমোহনকাকার দীক্ষিত শিষ্য ও তাঁর পরিবার। শ্রীমোহনকাকার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকায় তিনি নিজের ইচ্ছামতো কিছু করে যেতে পারেননি। আমাকে একদিন বলেন যে, আদি সেবায়িত যদুনন্দন চক্রবর্তীর একটি জীবনী এই বৈষ্ণবের কাছে তিনি দেখেছিলেন তুমি ওই বইটা জোগাড় করে দিতে পারো? কিন্তু মোহনকাকা জীবিত থাকাকালীন আমি সে বইটা জোগাড় করে দিতে পারিনি।

প্রাচীন সেবাইত শ্রী রাসবল্লভ মুখোপাধ্যায় (ভক্তিভূষণ) খুব পণ্ডিত জ্ঞানী-গুণী, সংসারি লোক ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শক্তিনন্দন মুখোপাধ্যায়। সেটা ১৮৮৫ সালের জন্মাষ্টমীর আগেকার ঘটনা। তখন ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশে নরদেহে বিরাজ করছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। দক্ষিণেশ্বরের পাশে গঙ্গাতীরবর্তী আড়িয়াদহ গ্রাম থেকে কাটোয়ার বিগ্রহ দর্শনে আগত বৈষ্ণবদের কাছ থেকে প্রথম শোনেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা। তখন তাঁর মন উতলা হয়ে ওঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। সেই সময় কলকাতা যাবার

রেললাইন স্থাপিত হয়নি এবং কোনও রাস্তাও ছিল না। জলপথে অর্থাৎ গঙ্গাপথে নৌকা অথবা স্টিমার যাতায়াত ছিল ১৮৮৫ সালে। তখন হোরমিলার অ্যান্ড কোম্পানির স্টিমার কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, কাটোয়া হয়ে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাতায়াত করত। এই প্রাচীন সেবায়েত একদিন পুত্রের উপরে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সেবার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শনের উদ্দেশে। সেটা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জন্মাষ্টমী তিথির ৫-৭ দিন আগেকার ঘটনা। স্টিমার থেকে নামলেন আড়িয়াদহের ঘাটে। যে আড়িয়াদহের মানুষ ছিলেন কাটোয়া গৌরাঙ্গ বাড়ির আদি প্রতিষ্ঠাতা দাস গদাধর। কাটোয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই আড়িয়াদহের গদাধর মহাপ্রভুর আলয়ে আশ্রয় পান।

উত্তরপাড়া ফেরিঘাটের গঙ্গার ঠিক অপর পারে দাস গঙ্গাধর প্রভুর পাটবাড়ির আজও বিদ্যমান যা বৈষ্ণবরা দর্শন করতে যান। বিশাল ঠাকুরবাড়ি সেখানে গদাধর আলয় নামে চিহ্নিত ঘর হয়েছে, যেখানে দাস গদাধর প্রভু তাঁর বাল্য ও যৌবনে বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রকটকালে এই ঠাকুরবাড়ি একাধিকবার দর্শন করেছিলেন। রাত্রি কাটিয়ে পরদিন সকালে তিনি আড়িয়াদহ হতে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করেন। তিনি কখনও রামকৃষ্ণদেবকে আগে দেখেননি। গিয়ে দেখলেন দক্ষিণেশ্বরের উন্মুক্ত প্রান্তরে গঙ্গার ধারে কয়েকজন ভক্তের মধ্যে বসে আছেন একজন। যিনি অনবরত ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন ভক্তদের সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, মধ্যমণি হয়ে যিনি বসে আছেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সে দিনটা ছিল ১ জুলাই ১৮৮৫ আর তিথিটা ছিল জন্মাষ্টমী। সেদিন কলকাতা থেকে নানা ভক্তরা এসেছেন জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য। তাই দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের বন্যা বইছে। ভক্তরা বেশিরভাগই কলকাতার লোক— বলরাম, নরেন, ছোটোনরেন, গিরিশ, নবগোপাল, রাখাল, লাটু প্রমুখ। যাঁরা পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে ভক্ত হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে আছেন। বিশেষত, নরেন যিনি পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ। যতদূর জানা যায়, বলরাম দাস ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসভূমি কাটোয়া থেকে এক বৈষ্ণব এসেছেন। শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'কইগো কাটোয়ার বৈষ্ণব?' তখন রাসবল্লভ মুখোপাধ্যায় উঠে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। ঠাকুরও তাঁকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সর্বগ্রাসী স্নেহের বন্ধনে বাঁধেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রকটকালে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপধাম দর্শন করলেও সন্ন্যাসভূমি কাটোয়া কোনোদিন দর্শন করেননি। তাই আনন্দ প্রকাশ করলেন, এই কাটোয়ার বৈষ্ণবের দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শনে যাওয়ার। তারপর শুরু হলো যথারীতি ঈশ্বর প্রসঙ্গ।

কাটোয়ার বৈষ্ণব প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর কি আবার জন্ম হয়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে, 'গীতাগ্রন্থে বলা আছে যে, মানুষ অন্তিমকালে যখন মৃত্যু আসন্ন, প্রায় তখন যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করে, তার সেইভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।' তিনি আরও বলেন যে, 'হরিণকে চিন্তা করে মৃত্যুবরণ করার ফলে, ভরত রাজার হরিণ জন্ম হয়েছিল।' তখন কাটোয়ার বৈষ্ণব বলেন যে, গীতায় উল্লেখিত আছে তা ঠিক। কিন্তু কেউ যদি পুরো ঘটনাটা দেখে বলে তবে তো বিশ্বাস হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন খুবই অসুস্থ এবং এর ঠিক একবছর পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শরীর খুবই খারাপ থাকায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। তাই বিরক্তির সুরে কাটোয়ার বৈষ্ণবকে বললেন, 'আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না, আবার ম'লে কী হয়? তুমি যা বলছ হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কী করে ভক্তি হয় সেই চেষ্টা কর। ভক্তিলাভের জন্য জন্মেছে।' তারপর বললেন, 'বাগানে আম খেতে এসেছ, সেই চেষ্টা কর। কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এসব খবরে কাজ কী?' তারপর ভক্ত ভৈরব গিরীশকে নিয়ে পড়লেন। গিরীশের পর কাটোয়ার বৈষ্ণবকে বললেন, 'তুমি তর্ক করা ছাড়। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল শব্দ করে। তারপর আর করে না। বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কী হবে, পণ্ডিতরা তো কত শ্লোক বলে, 'শীর্ণ গো-মণ্ডলী'। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে ঈশ্বর অনুভূতি থাকে ক'জনের? মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বললে তবে কি সিদ্ধির নেশা হবে? সিদ্ধি মুখে নিয়ে কুলকুচি করলে হবে না, সিদ্ধি পেটে ঢুকতে হবে তবেই নেশা হবে। এরপর ঈশ্বর প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে যায় ঠাকুরের চিকিৎসক আসায়। তখন কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে আবার আড়িয়াদহের দাস গদাধরের পাটবাড়িতে ফিরে যান এবং ৩-৪ দিন পর কাটোয়া শ্রীগৈরাঙ্গ মন্দিরে ফিরে আসেন।

শ্রীমোহনকাকার সঙ্গে কথা বলার পর আমি বাড়িতে শ্রীমোহনকাকার কাছে যা শুনেছিলাম তা আমার পিতাকে বলায় তিনি গৌড় শিরোমণি মহাশয়ের নাম শুনেই দু'হাত কপালে তুলে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন— এই যেখানে বসে আছি, অর্থাৎ বাবার বৈঠকখানা ও তার উপরে দ্বিতলে প্রাচীন ঘরবাড়ি এসবই তাঁরই সম্পত্তি। আমার বাবা তাঁর পিতামহের (১৮৫০- ১৯৩০) কাছে শুনেছেন যে, গৌড় শিরোমণি মহাশয় বৃন্দাবন চলে যাওয়ার পর তাঁর পুত্র রাসবল্লভ ও বৈষ্ণবচরণ এই ভূমিখণ্ডে বাস করতেন। রাসবল্লভের পুত্র শক্তিনন্দন মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী গুরুদাসী দেবী, তাঁর কোনরকমে উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি এ সম্পত্তি আমার পিতাকে বিক্রি করে দিয়ে তাঁর পিতার বাড়ি চলে যান। সেটা ১৯৩৪ সালের ঘটনা। পিত্রালয় নানুর থানার থিবা গ্রামে চলে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তারপর অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় এবং পুরাতন বাড়ি ভগ্নাপ্রায় হয়ে যায়। আমার বাবা তখন মহাপ্রভুর সেবাইতের সম্পত্তি হওয়ায় তা ক্রয় করতে মনস্থ করেন। ঠিক এই সময়ে দরিদ্রতা বশত ওই নিঃসন্তান বিধবা এ সম্পত্তি ভোগদখলের কোনও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকায় তা বিক্রি করে দিতে মনস্থ করেন। কারণ ওই মুখোপাধ্যায় বংশে কোনও পুরুষ নেই। যদিও কাটোয়ার কীর্তিস্বরূপ এই গৃহ সংরক্ষণ যোগ্য ছিল। সেই সম্পত্তি ৬৯৯ টাকা মূল্যে গ্রহণ করে চারকাঠা জমির উপর নিষ্কর স্বতীয় বাস্তু জায়গা ও তদুপরি ভগ্নপ্রায় ইমারত বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রেতা শ্রীমতী গুরুদাসী দেবী (স্বামী শক্তিনন্দন মুখোপাধ্যায়), ক্রেতা আমার পিতা অর্থাৎ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পিতা-রাজবিহারী চট্টোপাধ্যায়, পরিশেষে বাবা আমাকে বললেন যে, এই স্থান অতি পবিত্র স্থান। এই স্থানে যিনি বাস করতেন, তিনি পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহধন্য ছিলেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

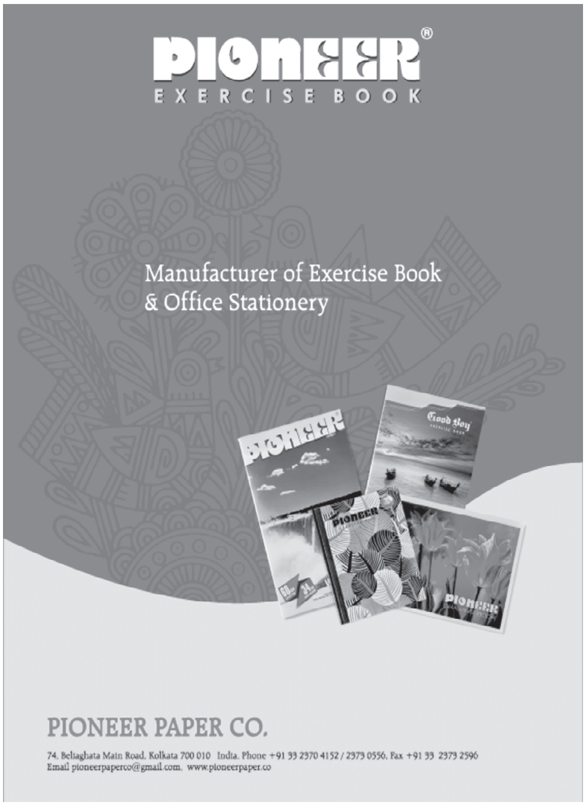

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

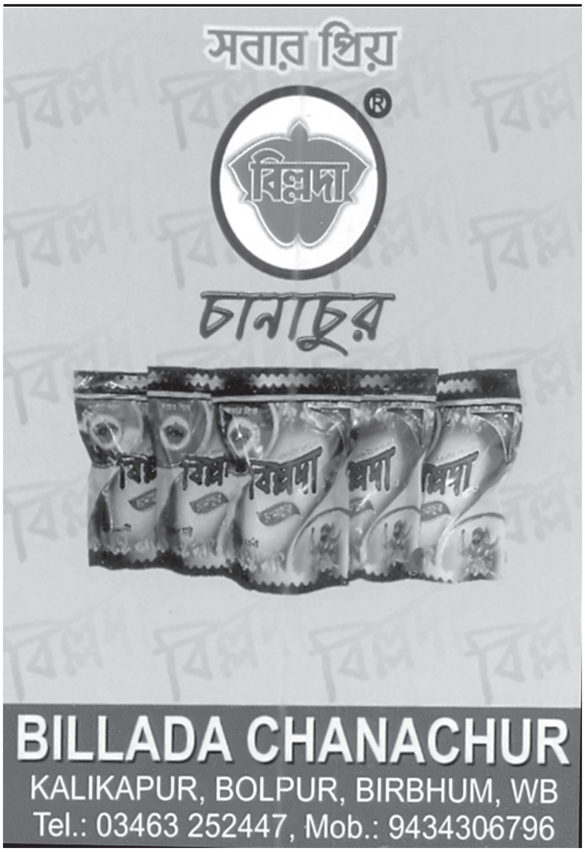

বাঙ্গলা সাহিত্যের সংকট

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মসংস্কৃতি নিবিড়ভাবে যুক্ত। চর্যাগীতি থেকে শাক্তগীতি ধর্মসংস্কৃতি অস্বীকার করেনি। ভুল হলো, অঙ্গীকার করেছে। আধুনিকতার প্রথম অভিঘাতের দিনগুলোতে আমাদের পশ্চিমি শিক্ষাবিধি আর পাশ্চাত্যের প্রতি তীব্র আসক্তি চিরাচরিত ধর্মসংস্কৃতির প্রতি আপত্তি জানাতে থাকে। শ্রী মধুসূদনে এই অভিঘাত তীব্র। বিশেষত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। তাঁর রচনায় যুক্তি কিছুটা দুর্বল মনে হয়। একদিকে তিনি রামচন্দ্রকে আক্রমণকারী বলছেন, অন্যদিকে 'জ্বলন্ত পাবক শিখারূপিণী' সীতাহরণকে সমালোচনা করছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে 'গঙ্গোদক' ছাড়া মেঘনাদের চলছে না। রাবণকে চিত্রাঙ্গদা 'নিজকর্মদোষে' নিমজ্জিত হবার জন্য তিরস্কার করছেন। তাহলে, রামচন্দ্র সীতালাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতেই গেছেন—সেকথা মধুসূদন ভোলেননি।

রবীন্দ্রসাহিত্য নিরঙ্কুশভাবে উপনিষদকে একালের সাহিত্য পদবাচ্য করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মর্মে আছে ধর্ম ও সমাজে চিরাচরিত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করার প্রয়াস। 'বিসর্জন'-'মালিনী'- 'অচলায়তন'-'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে ধর্মের কালোচিত পরিক্রমা, রক্ষণশীলতা আর পরিবর্তনের চাহিদা ও সমস্যা ধরা পড়েছে। হিন্দুধর্ম চিরকাল এইরকম বিতর্ককে পরিসর দিয়েছে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ধ্যানধারণা, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিষয়ে ভেবেছেন। গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় সমালোচকদের একটি বড়ো অংশ এখানে আলো ফেলে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ভিত্তি আলগা করার চেষ্টা করেছেন। এটি বিভ্রান্তিকর। এই সন্ধানের মধ্যে নীতির ভূমিকা প্রধান। নিখিলেশ নীতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সন্দীপ নীতিহীন, ফলে চরিত্রহীন।

বামপন্থী রাজনীতি সারা বিশ্বেই প্রচারধর্মী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মতলবি মত প্রকাশ করার চেষ্টা করে। বিপ্লবের আগে রুশ সাহিত্যের ধ্রুপদী উচ্চতা হ্রাস পায়। পুশকিন থেকে টলস্টয়ের সাহিত্যের অভিজাত্য, দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের নৈতিক হাহাকার, চেখভের তির্যক হাস্যরস, ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' বা নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'হাউ দ্য স্টিল ইজ টেম্পার্ড' সেই উচ্চতা, ধ্রুপদী আভিজাত্য বা বৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারেনি। বিপ্লবোত্তর রুশ-সাহিত্য সরকারি প্রচার কিংবা সমান্তরাল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদকে সমূলে নির্বাসিত করা হয়েছে! ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম সহজেই নজরে আসে। ফরাসি বিপ্লবের আগেকার অভিজাত সাহিত্য নতুন নতুন মানবিক মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়। ফরাসি বিপ্লব সাহিত্যকে মুক্ত করেছে। রুশ বিপ্লব তাকে বদ্ধ বন্দি ও বিপন্ন করেছে।

শরৎচন্দ্র-সতীনাথ ভাদুড়ী-বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সমাজ-রাজনীতি-প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতা এসেছে। নজরুলের রচনায় দেশ ও পুরাণ এসেছে—তাঁর লেখা আরবী-বেদুইনমনস্ক নয়। স্বাধীনতার পর বামপন্থীরা এই পরিস্থিতি আমূল বদলে দিয়েছেন। হাতেগরম বিপ্লবের বিচিত্রমনা চাহিদা ও জোগান তাদের চেষ্টা। প্রতিভা দীপ্ত সাহিত্যিকদের পক্ষে বামপন্থা আবর্জনা কুণ্ড ছাড়া কিছু না। এর প্রমাণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-বিজন ভট্টাচার্য-দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের প্রতিভা বাম-আবেষ্টনীতে অবক্ষয়িত হয়েছে। শেষ দুজন সরে এসেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি কবিতায় লিখেছেন :

'লেখকের দল/দিয়ে দানাজল/। বসিয়ে খাঁচায়/ওরা
লেখা চায়/খাঁচা ছেড়ে তাই মেলেছি ডানা।'

একই কথা সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে। তিনিও পচে যাওয়ার আগে ওই হুকুমদার সাহিত্য-মুরুব্বিদের হাত ছেড়েছেন।

একালের সাহিত্য আর জনমনকে প্রভাবিত করছে না। এর সূচনা কখন থেকে? ঠিক মতো নির্ণয় করা কঠিন। কল্লোল-কালিকলমের অতি বাস্তবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ ক্রমেই শিল্পের জন্য শিল্প (art for art's sake) তত্ত্ব নিয়ে আসা অর্থহীন বিকল্পে রূপান্তরিত হলো। লেখা হয়ে উঠল বিকারের নরককুণ্ড। বামপন্থীদের দারিদ্র্য-ভিত্তিক শ্রেণী সংগ্রাম থেকে এল হাংরি-জেনারেশনের মতো 'মদ্যপদ্য আন্দোলন'। বঙ্গভঙ্গ বঙ্গসংস্কৃতিকে ভেঙেছিল। সেই ভাঙন ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ'-এর মতোই বিচিত্র—মনস্তাত্ত্বিক রোগী বললেই ঠিক হয়।, তারা সাহিত্যের চৌকো বাক্সে ভরতে চায় ধর্মান্ধতার ষড়ভুজ। একসময় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কিছুমাত্র না বুঝে তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। হোসেন সিরাজির মতো বঙ্কিম উপন্যাসের প্যারডি শিখেই তাদের সাহিত্য সাধনার ইতি ঘটেছে। এসব অ-সাহিত্য নিয়ে এখানে আলোচনা করে সময় নষ্ট বা পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষা করার বাসনা নেই।

বাংলা সাহিত্য এখন যা কিছু বিকৃতি তাকেই তুলে আনার চেষ্টা করছে। কেউ লিখছেন উন্নয়ন ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ লিখছেন ত্রিশূলে জন্মনিয়ন্ত্রণের পলিমার মুড়তে। শ্রীজাতকে গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। কিন্তু একসময়ের প্রধান কবি শঙ্খ ঘোষ যখন জেলাস্তরের গুন্ডাপ্রকৃতির নেতার প্রসঙ্গে 'ত্রিশূল' শব্দ ব্যবহার করেন তখন হতাশ হওয়া ছাড়া কী আর উপায় থাকে! যুগ যুগ ধরে জাতির মগ্নচৈতন্যে এক ধরনের রূপক-নির্মাণ হয়। তা অস্বীকার করলে সাহিত্য ধর্মভ্রষ্ট হয়। ■

অবক্ষয়ের ভেদরেখা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র তার সুচনা লগ্নে প্রারম্ভিক যে অভিমুখ স্থির করে যাত্রা শুরু করেছিল তা ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন। এই কথার প্রতিধ্বনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু হৃদয়বিদারক ভাবে একেবারে হালে শোনা গেছে Dirty Picture ছবিতে। ৭০-এর দশকের দক্ষিণী নৃত্যপটিয়সী চলচ্চিত্র শিল্পী সিল্ক স্মিতার চলচ্চিত্র-কলঙ্কিত জীবনভিত্তিক এই ছবিতে নায়িকা বিদ্যাবালন বলছেন তাঁর কাজ ও লক্ষ্য একটাই তা হলো entertainment, entertainment ও entertainment তা যেভাবেই হোক না কেন।

৭০-এর দশক থেকে ৯০-এর দশক অবধি কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের খাতিরে হিন্দি ছবিতে নারী শরীরের প্রদর্শনী সংবলিত একাধিক নৃত্যদৃশ্য নির্মাণ ছিল আবশ্যিক শর্ত। আর এটিই মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক ও সিরিয়াস ভাবনার ছায়াছবিতে অভ্যস্ত বাঙ্গালি দর্শকের ও তার পূববর্তী প্রজন্মের কাছে ছিল নিতান্তই অবক্ষয়ী চিন্তার নিদর্শন। অবক্ষয় কথাটি গোলমেলে। বাঙ্গলা চলচ্চিত্র সমাজের প্রতিবিম্ব ও প্রতিধ্বনি হওয়ার দায়বদ্ধতা ১৯৫৫-য় পথের পাঁচালির জন্মলগ্ন থেকেই এক রকম স্বীকার করে নেয়।

ঋত্বিক ঘটক সদম্ভে বলেছিলেন ''যে দিন বুঝব চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজের সৎ বক্তব্য তুলে ধরতে পারছি না সেদিনই এই মাধ্যমকে লাথি মেরে চলে যাব।'' এ সবই ৫০-এর দশকে সবাক চলচ্চিত্রের আগমনের পরবর্তী সময়ের কথা। ৩০ থেকে ৫০-এর দশক অবধি মূলত শরৎচন্দ্র, নিরুপমাদেবী বা নিউ থিয়েটার্সের নিজস্ব কাহিনি লিখন বিভাগের রচনার ভিত্তিতে যে ছবিগুলি নির্মিত হতো দর্শক তা সানন্দে গ্রহণ করেছে। সেই সময় যেহেতু বিদেশি কিছু ছবি ছাড়া দশর্কের হাতে প্রতি-তুলনা করার মতো কিছু ছিল না তাই অবক্ষয়ের অর্থাৎ অবনমন বা মূল্যবোধহীনতা যাই বলা যাক না কেন তা ছিল অস্তিত্বহীন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক ইংরেজের বহু ছবি বাঙ্গলা প্রেক্ষাগৃহগুলিতে সাড়ম্বরে প্রদর্শিত হতো। সেসব ছবি সেনসর ছাড়পত্র পেলেও সেখানে চুম্বন ও খোলামেলা দৃশ্যের অভাব ছিল না। এক সময়ের বোম্বে টকিজের ৩০-এর দশকের বহু ছবিতেও ইংরেজি ছবির দেখাদেখি চুম্বন দৃশ্য ছিল আকছার। পরবর্তীকালে সমাজ মানসের বিচিত্র টানাপোড়েনে তা ব্রাত্য হয়ে পড়ে। ফলে নায়ক নায়িকার সরল চুম্বন দৃশ্যের বিকল্পে বিচিত্র ভঙ্গিমায় পরস্পরের নৈকট্য বোঝাতে নানা কদর্য দৃশ্যের অবতরণা হয়। নির্দিষ্ট চলচ্চিত্র রুচির, মানসিকতার এটি নিশ্চিত অবক্ষয়।

বাঙ্গলায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রের বাজার পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। দেশভাগজনিত হতাশার ছায়া চলচ্চিত্রে পড়েছিল। অবক্ষয় নিয়ে বুক চাপড়ানোর আগে চলচ্চিত্রের মতো চূড়ান্ত অনিশ্চিত একটি মাধ্যমে অর্থ লগ্নি করে পরের ছবিটি তৈরি করার নিশ্চয়তা পাওয়া যে দুষ্কর সেটা মনে রাখা জরুরি। এখানে সদাসর্বদাই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে সেই মন্থনে অযান্ত্রিক জলসাঘর সুবর্ণরেখার সঙ্গে ৩৬ চৌরঙ্গী লেন বা একেবারে সাম্প্রতিক সিনেমাওয়ালা বা বেলাশেষে কিংবা রামধনুর মতো ছবি উঠে আসতে পারে। উত্তম ৫৫ থেকে ৮০ আমৃত্যু বাঙ্গালিকে তার পরিচিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সফলভাবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। মনে পড়বে তাঁর কালজয়ী 'সপ্তপদী'তেও তিনি ধুতি পরে বাইক চালিয়েছিলেন। অধিকাংশ ছবিতে বাঙ্গালির পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবিই ছিল তাঁর পরিধেয়। সময়ের প্রয়োজনে এই পোশাক পরিবর্তন কালপ্রবাহ, সাংস্কৃতির মিশ্রণ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনের অঙ্গীভূত— একে কি অবক্ষয় বলা যাবে? একটা সময় রেডিয়োতে হিন্দি গান শোনাও ছিল বাঙ্গালির রুচিহীনতার পরিচায়ক। হিন্দি ছবি যারা দেখতেন তাঁদের তকমা ছিল অশিক্ষিত মনন ও অর্ধশিক্ষার ফসল। অথচ ৫০-এর দশকে 'মাদার ইন্ডিয়া' বা 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজতে' সামাজিক আপত্তি ছিল না। নিশ্চিতভাবেই সিনেমা শিল্পে টিকে থাকতে অনেক সময় বহু পরিচালককেই এর নান্দনিক দিকটিকে কাটছাঁট করতে হয়। ববি, শোলে, দিওয়ারের সাফল্য হিন্দি বাঙ্গলার দৃশ্যমান বিভাজনরেখা মুছে দেয়। বাঙ্গলা ছবি যখন উত্তম মৃত্যুর পর দিশাহীনতায় ভুগেছে তখন মোটা দাগের হিট হিন্দি বা তামিল ছবির অন্ধ অনুকরণে টিকে থাকতে চেয়েছে। চলচ্চিত্রের প্রবাহ কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। বাঙ্গলা ছবি নির্মাণের সংখ্যা বা আবেগ কোনোটাই কমেনি। বুদ্ধদেব, গৌতম, অপর্ণা, ঋতুপর্ণর পর চমৎকার সব নতুন আঙ্গিক আর অভাবনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সার্থক মনোরঞ্জন ও নান্দনিকতার চূড়ান্ত মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন শিবপ্রসাদ, কৌশিক কমলেশ্বররা। সব সময়ই খাওয়ার পদে ডাল, সুক্তো, চচ্চড়ির সঙ্গে পায়েসও থাকে। হতাশ হওয়ার প্রশ্নই নেই। চলচ্চিত্র কোনো স্থির নিরালম্ব মাধ্যম নয়। এটি প্রযোজক-পরিচালক-দর্শকদের যৌথ অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কালানুবর্তী তো নিশ্চয়। তাই বিবর্তন ও অবক্ষয়ের ভেদরেখা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে। ■

নববর্ষে আশার আলো

বিজয় আঢ্য

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙ্গালির চিন্তা-ভাবনা বাংলা তথা ভারতের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এক সুদৃঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই সত্য সকলেই কমবেশি স্বীকার করবেন। এক সময় বলা হতো, বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজই জাতির মেরুদণ্ড। কারণ দেশ ও সমাজের যাঁরা মাথা তাঁরা প্রায় সবাই এই সমাজের মধ্য থেকে উঠে এসেছেন। তা শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, চিকিৎসা, আইন, রাজনীতি, খেলাধুলা যাই হোক না কেন। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য, বিংশশতকের বাঙ্গালিকে পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা গ্রাস করেছিল। কবির আক্ষেপোক্তিতেও তার প্রমাণ মেলে— 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ করনি।'

যে-বাঙ্গালির আজও মনুষ্যত্ব অর্জনের ক্ষমতা বা ইচ্ছা আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তারা সকলেই নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় 'নব্যতম নৈয়ায়িক বা নব্যতম স্মার্ত' হয়ে গিয়েছেন। ...তাহারা বড়াই করিয়া বলেন, 'আমরা মার্কসিস্ট।' বিশেষত, সত্তর বছর আগে ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদের দেশভাগ বাঙ্গালিকে এক সীমাহীন বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। গত সাত দশকেও এর থেকে পরিত্রাণ পায়নি বাঙ্গালি বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে হিন্দু বাঙ্গালি। দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এই মার্কসিস্ট বা কমিউনিস্টরা একের পর এক আন্দোলন চালিয়েছিল। উদ্বাস্তুদের জন্য কলোনি পত্তন আন্দোলন, ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন। এইসবের ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হলো। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ শুধু এই পাঁচবছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চারবার বিধানসভার ভোট ও চারবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে। রাজনৈতিক এই দলাদলির ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক জাতপাতের সৃষ্টি হলো। যার পরিণাম দলীয় সংঘর্ষ, খুন, জখম, অপহরণ। সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে। বস্তুত ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ — এই তিরিশ বছর পশ্চিমবঙ্গে খুবই উত্তাল সময় গেছে।

গত পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক স্থিতি এবং জনভারসাম্য অনেকটাই বদলে গেছে। আজ সমাজে সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা কমেছে। ফ্যান, টিভি, ফোন বহু পরিবারেই আছে। বহু বাড়িতে বাড়তির মধ্যে আছে ফ্রিজ, ওয়াশিংমেশিন, গাড়ি। এখন এরাজ্যে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলিরই রমরমা। ১৯৯০ সাল থেকেই কলকাতার বাংলামাধ্যম স্কুলগুলি ধুঁকতে শুরু করেছে। ইংরেজি আজ বাঙ্গালির অস্থিমজ্জায় এমনভাবে ঢুকে গেছে যে দাদু তার বছর চারেকের এক নাতনিকে স্কুলের গেটের কাছে বলছেন— No my child. Don't be silly. come this side. এখন কলকাতার বাড়ির নম্বর, নেমপ্লেট, দোকানের সাইনবোর্ড— সবই প্রায় ইংরেজিতে। 'আমার এই বাংলা ভাষা'— আজ শুধু কথার কথা।

আগে একটা পারিবারিক শাসন ছিল। এমনকী পাড়ার বড়োদেরও শাসনের অধিকার ছিল। এখন ছাত্রের কান মুললেও অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকদের কৈফিয়ত দিতে হয়। ভাই-বোনের সংখ্যা বেশি থাকায় ভাগ করে খেতে শিখত। এখন উল্টো। নিজেরটা না পেলে বাবা-মাকেই হুমকি দেয়। এছাড়া অ্যানড্রয়েড ফোন আসায় সত্যিই 'দুনিয়া মুঠ্‌ঠি মে'। বিশ্বজুড়ে এই ভোগবাদের প্রাবল্যে পশ্চিমবঙ্গের পরিবার ও সমাজ প্রভাবিত। আত্মকেন্দ্রিকতা যার মূল কথা।

আর এক কথা। দেশভাগের আগে যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল। প্রতি পরিবারে গড় সন্তান সংখ্যা ছিল অন্তত ছয়-সাত। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, 'হাম দো'— হয়তো খুব বেশি হলে 'হমারা দো'। তারা প্রায় সবাই এক সন্তান বা One child Family আঁকড়ে ধরেছেন। এর পরিণতিতে হিন্দু সমাজে জনবৃদ্ধির হার আজ শূন্যে, ঠিকঠিক খতিয়ে দেখলে তা বিয়োগান্তে বা মাইনাসে (–) এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুসমাজ আজ ক্রম সঙ্কুচিত। ভারতের পাঞ্জাব ছাড়া আর কোনও রাজ্য দেশভাগের যন্ত্রণায় এমন ক্ষতবিক্ষত হয়নি। বরং সেই জ্বালা ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদের দৌলতে আজ এক বিকট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত চার দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে ১ কোটিরও বেশি বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ ঘটছে ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হচ্ছে। পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই এখন খাগড়াগড়— ইসলামি মৌলবাদীদের অস্ত্র তৈরির কারখানা হয়ে উঠেছে। পরিকল্পিতভাবে এ রাজ্যের জনভারসাম্যের পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে —এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। তবে আশার কথা এই, এতসবের পরেও বাঙ্গালির সমাজের একাংশ, বিশেষত নবীন প্রজন্ম নিজেদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে যুগানুকূল করে অন্তত কিছুটা হলেও ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। বিকাশ ও প্রযুক্তিকেও কাজে লাগাচ্ছে। কামদুনি বা বারাসতের মতো নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, দেগঙ্গা, বসিরহাটে বা হাওড়ার তেহট্ট স্কুলে মৌলবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের অবদানকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায়, দেশ ও জাতীয় জীবন গঠনে রাম, কৃষ্ণ, শিবাজী, রাণা প্রতাপের মতো ঐতিহাসিক পুরুষদের স্মরণ-মননে, দেশ ও দুনিয়ার চলমান ঘটনা বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি নজরকাড়ার মতো। নবীনদের এই নবচেতনায় উদ্দীপ্ত হওয়াই নতুন বছরের শুরুতে এক আশার আলো বলে মনে হচ্ছে।

ফিরে এসো সৌজন্য

ধ্বংস হোক টয়লেট রাজনীতি

সনাতন রায়

পশ্চিমবঙ্গে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বীরভূমের লাল মাটির বুক কাঁপিয়ে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল হুমকি দিয়েছিলেন, ভোটে 'চড়াম চড়াম' শব্দ তুলে ঢাক বাজবে। ঢাকের চামড়াটা যে তৃণমূল বিরোধীদের পিঠের চামড়া সেটা স্পষ্ট করে বলেননি কিন্তু ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট ছিল না। আর বলেছিলেন, ভোটাররা ভোট দিতে এলে গুড়বাতাসা খাওয়ানো হবে। সেই অনুব্রতই এবার সাংসদ নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের হাতে পাঁচন (কাঁচা বাঁশের লাঠি) তুলে দিয়ে বলেছেন, ঝামেলা করলে পাঁচনের বাড়ি পড়বে পিঠে। তা সে বিরোধী দল কিংবা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী যেই-ই হোক না কেন। এখানেই থামেননি অনুব্রত। ভোটারদের নকুলদানা বিলোচ্ছেন ভোটের প্রচারে বেরিয়ে। নকুলদানার যে আরেক নাম দেশি বোমা আর বন্দুকের ছররা— সে তো কারো অজানা নয়।

বঙ্গ রাজনীতির সংস্কৃতির ময়দানে অনুব্রত এক নয়া অনুসঙ্গ। আসলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার আর সৌজন্যবোধের এহেন অবলুপ্তির মূল অনুঘটকের কাজ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যিনি মানুষের মনে মোদী বিরোধিতা তীব্র করে তুলতে একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গোটা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীকে হিটলার, স্ট্যালিন— এমনকী গব্বর সিংহ আখ্যায় ভূষিত করতেও দ্বিধা করেননি। গত পাঁচবছর ধরে প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে ভরবেন বলে শাসাচ্ছেন। আর নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ'-এর সঙ্গে তাল ঠুকতেই বোধহয় কলকাতার মতো ঐতিহ্যশীল শহরের অর্ধশিক্ষিত প্রথম নাগরিক মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বামপন্থী প্রার্থী অতি উচ্চ শিক্ষিতা অধ্যাপিকা ড. নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের মতো

জনগণগ্রাহ্য এক ভদ্রমহিলাকে রকবাজ ইভটিজারদের ভাষায় 'কে তুমি, নন্দিনী' বলে অশ্লীল ইঙ্গিত করতেও দ্বিধা করেন না। গোটা বাঙ্গলার রাজনৈতিক ময়দানে আজ তাই শুধু অসাংবিধানিক ভাষাই নয়, অশ্লীল ভাষার বান ডেকেছে।

এর কারণটা অবশ্য ঐতিহাসিক। পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রগুলি ল্যাটিন ভাষা ও ধর্মীয় প্রভাবের আধিপত্যমুক্ত হয়ে যে শ্রমে ও সদিচ্ছায় জাতিরাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল সেই ধারা ঔপনিবেশিক চরিত্র থেকেমুক্ত হতে ভারতীয় উপমহাদেশকে সাহায্য করেনি। ফলে আদর্শগত বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জনের বদলে শাসকদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে হস্তান্তর ঘটানোর ফলে আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবর্তনও ঘটেনি। পরিণতি হলো : সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেনি। সৌজন্যবোধ ঐতিহ্য ভুলে ভিন্ন পথে পা বাড়িয়েছে। আমরা কি কেউ ভুলতে পারব বা অস্বীকার করতে পারব যে ভারতবর্ষের বিভাজনের মধ্য দিয়ে গঠিত দুটি নতুন দেশ ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা এসেছিল দুটি রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের মধ্য দিয়ে এবং দুটিই পৃথগন্ন হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আশীর্বাদের দাক্ষিণ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে বিদ্বেষ-বিরূপতা, সংহিতার সংঘাত। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে শুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি।

আসলে এই মূল্যবোধহীন এবং শিষ্টাচারহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যক্তিগত অহংবোধ এবং রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। আদর্শের অভাব, নীতির অভাব এবং রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকট থেকে উদ্ভূত এই অপসংস্কৃতির রাজনীতি ভয়ংকর ভাবে অপরিশীলিত। ফলত সংসদে দাঁড়িয়ে জনপ্রতিনিধিদের ভাষা এতটাই অসংযত হয়ে ওঠে কখনও কখনও তা কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকতে হয় স্পিকার মহোদয়কে। অসহিষ্ণুতা, স্থূল আচরণ, অযৌক্তিক বিতর্ক এবং অকারণ আক্রমণ প্রতি মুহূর্তে আজকের রাজনীতিকে পদদলিত করছে। কেউ একটিবার ভেবেও দেখেন না, বিশ্ব রাজনীতির দরবারে ভারতীয় রাজনৈতিক মহলের এই আচরণ কোন বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে! ভদ্রতা, বিনয়, সদাচার রাজনীতি থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পিছনে মূল দায় অবশ্যই অগ্রজ রাজনীতিবিদদের যাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন না করে উড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে বীতশ্রদ্ধ পরিশীলিত মেধাবী ও বৌদ্ধিক জনগণ নিঃশব্দে রাজনীতির দরজাগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছেন নিজের পথে। রাজনীতির পথে হাঁটেননি।

ভোট এসে গেছে। রাষ্ট্রের নতুন সরকার গঠনের ভোট। শুরু হয়ে গেছে জোরদার প্রচার। দেওয়াল লিখন, পোস্টার এসব গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে ডিজিটাল মিডিয়ার দেওয়ালে দেওয়ালে গান, ছড়া, ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে স্লোগানের আস্ফালন। এখনই উন্মুক্ত মন নিয়ে চিন্তাভাবনার দরকার— কোন ভাষায় রাজনৈতিক স্লোগানকে বিধৃত করবেন রাজনীতিবিদরা! মিথ্যা কলঙ্কের দায় বিপক্ষের ঘাড়ে চাপানো থেকে নিবৃত্ত থেকেও কীভাবে রাজনৈতিক জয়ের স্বাদ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত অধ্যায়গুলির অনুসরণ না করে কীভাবে আরও একবার নিজেদের মানসিকতাকে টয়লেট-রাজনীতির প্রকোপ থেকে মুক্ত করে, এযাবৎ গড়ে ওঠা ভুলগুলোকে পরিত্যাগ করে, অগ্রজদের ভুলগুলিকে সংশোধন করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়, রত হওয়া যায় বিপরীত পথের চর্চায় আর শুভযাত্রার উন্মোচন করা যায় চৈতন্যের শুদ্ধতার পথে। ▮

বাঙ্গালির নবজাগরণ ও হিন্দুত্বের ভাবনা

একলব্য সোম

উনিশ শতকে বাঙ্গালির নবজাগরণের সঙ্গে হিন্দুত্বের ভাবনা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত ছিল। বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা বিষয়টি অনেকেই অস্বীকার করতে পারেননি। বিদেশি ভাবধারায় লালিত পালিত হয়ে বাংলার 'নবজাগরণ'কে তাঁরা মানতে চাননি। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বাঙ্গালির নবজাগরণে হিন্দুত্বের ধ্যান-ধারণা জড়িত থাকায় বিষবৎ তারা একে পরিত্যাজ্য করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ যখন মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, তখন মহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রমুখ ইসলামিক বুদ্ধিজীবী নিজস্ব ধর্মভাবনার ঊর্ধ্বে তাদের সামাজিক চিন্তনকে উঠতে দেননি।

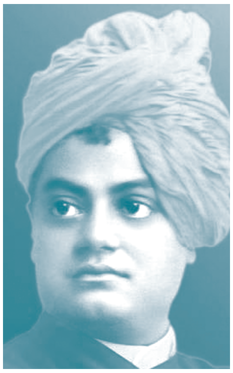

বামপন্থা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো স্বদেশ-সচেতন ঐতিহাসিকদের অপসারিত করে তপন রায়চৌধুরী, ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপারের মতো বামপন্থী ঐতিহাসিকরা জাঁকিয়ে বসে ভারতের ইতিহাস রচনার নামে হিন্দুত্ব তথা ভারতীয়ত্বের ভাবনাকেই অপমানিত করতে শুরু করলেন। সেকুলারিজমের ধুয়ো তুলে ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মতো হিন্দুধর্মকেও তাঁরা সেমেটিক ধর্মে পরিণত করে দিয়েছিলেন। এই প্রবণতাই আজকের দিনে ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। মুসলমান সমাজ খাঁটি মুসলমান পেয়েছে কিন্তু হিন্দুসমাজ সেকুলার নামে মুসলিম তাঁবেদার ক্লীবলিঙ্গই উপহার পেয়েছে। এতে মুসলমান সমাজের ক্ষতি হয়নি, কিন্তু হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতাকে অস্বীকার করায় ভারত তথা বঙ্গ ভাগ হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে দেশটা আজও পুড়ে মরছে আর সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দাতারা 'সেকুলার'-এর ছদ্মবেশে হিন্দুধর্মের ঔদার্যকে ধূলিসাৎ করতে উদ্যত।

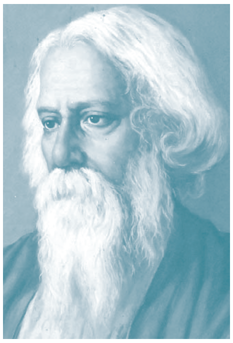

ভুলে গেলে চলবে না ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে বাঙ্গালি রুখে দিতে পেরেছিল, সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের সাহায্য না পেলেও মৌলবি লিয়াকত আলির মতো কয়েকজন ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেদিন সদ্যোজাত মুসলিম লিগ আর জন্ম না হওয়া কমিউনিস্ট পার্টির বলা বাহুল্য এমন কোনো শক্তি ছিল না যা দিয়ে ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তকে মদত দেওয়া চলত। অথচ মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে খেলা ঘুরে গেল। মুসলিম লিগ আর কমিউনিস্ট ঐক্য দাবি তুলল 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' উনিশ শতকে নবজাগরণের কালে হিন্দুধর্ম যে সার্বভৌমিকতার দৃষ্টান্ত রেখেছিল, বিংশ শতাব্দীতেও তা বজায় রাখতে পারলে দেশভাগের যন্ত্রণা-বেদনা বাঙ্গালির জন্য বরাদ্দ থাকতো না।

নবজাগরণের সময় বাঙ্গালির হিন্দুত্বের রূপটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। একদিকে ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর উপন্যাসে দেশভক্তির চেতনা ছিল, পরবর্তীকালে প্রচার ও নবজীবন পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীতে হিন্দুত্বের দর্শনের আভাস পাওয়া যায়, বিশেষ করে কৃষ্ণচরিত্রে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। এই সময়কালীন বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক কোঁতের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। চার্বাক দর্শনেও ঈশ্বরের স্থান নেই। কিন্তু এর পুরো সত্তাই হিন্দুধর্মের সঙ্গে জড়িত। বঙ্কিম-বান্ধব চন্দ্রনাথ বসু 'হিন্দুত্ব' নামে হিন্দুধর্মের ইতিহাসও লিখেছিলেন।

একদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি সমসময়ে কলকাতা ও বাঙ্গলা জুড়ে যে হিন্দুধর্মের প্রচার করছিলেন, তাঁর ধর্মব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিকতার ছোঁয়া ছিল। হিন্দুধর্মের নীতি-নিয়মগুলিকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আধুনিকতার নামে শশধর তর্কচূড়ামণিকে আজ বক্রোক্তির মুখে পড়তে হয়, কিন্তু যাঁরা এটা করেন তাঁদের ইতিহাসবোধ নেই। কারণ এক সময় কলকাতার যুবকবৃন্দ যাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত)-ও ছিলেন দলে দলে ধাবিত হয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য। খোদ বঙ্কিমচন্দ্র অ্যালাবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতা শোনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিম-শশধরের মতানৈক্য অবশ্যই ছিল বিশেষ করে ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মান্যতা দিয়েছিলেন তর্কচূড়ামণি। কিন্তু এঁরা দু'জনেই ছিলেন হিন্দু ধর্মচর্চার একনিষ্ঠ সেবক।

অন্যদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের প্রচার করেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সমস্ত উপাসনা-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে বুঝেছিলেন— 'সব ধর্ম আসবে-যাবে, হিন্দুধর্ম থাকবে।' সুতরাং হিন্দুধর্মের সুবিশাল ব্যপ্তি, 'নানা মত নানা পথ' একে ভারতীয়ত্বের প্রতিশব্দে পরিণত করে তুলেছিল বাঙ্গালির নবজাগরণ কালে। শুধু ধর্মীয় চেতনাই নয়, রাজনারায়ণ বসুর পরামর্শে নবগোপাল মিত্র, মনমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দুমেলার পত্তন করে বাঙ্গালির জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে।

আজকে যাঁরা বাঙ্গালির 'সেন্টিমেন্টে'র ধুয়ো তুলে সেকুলারিজমের নামে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে উদ্যত তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না, নয়তো কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইতিহাস ভোলাতে চাইছেন। ■

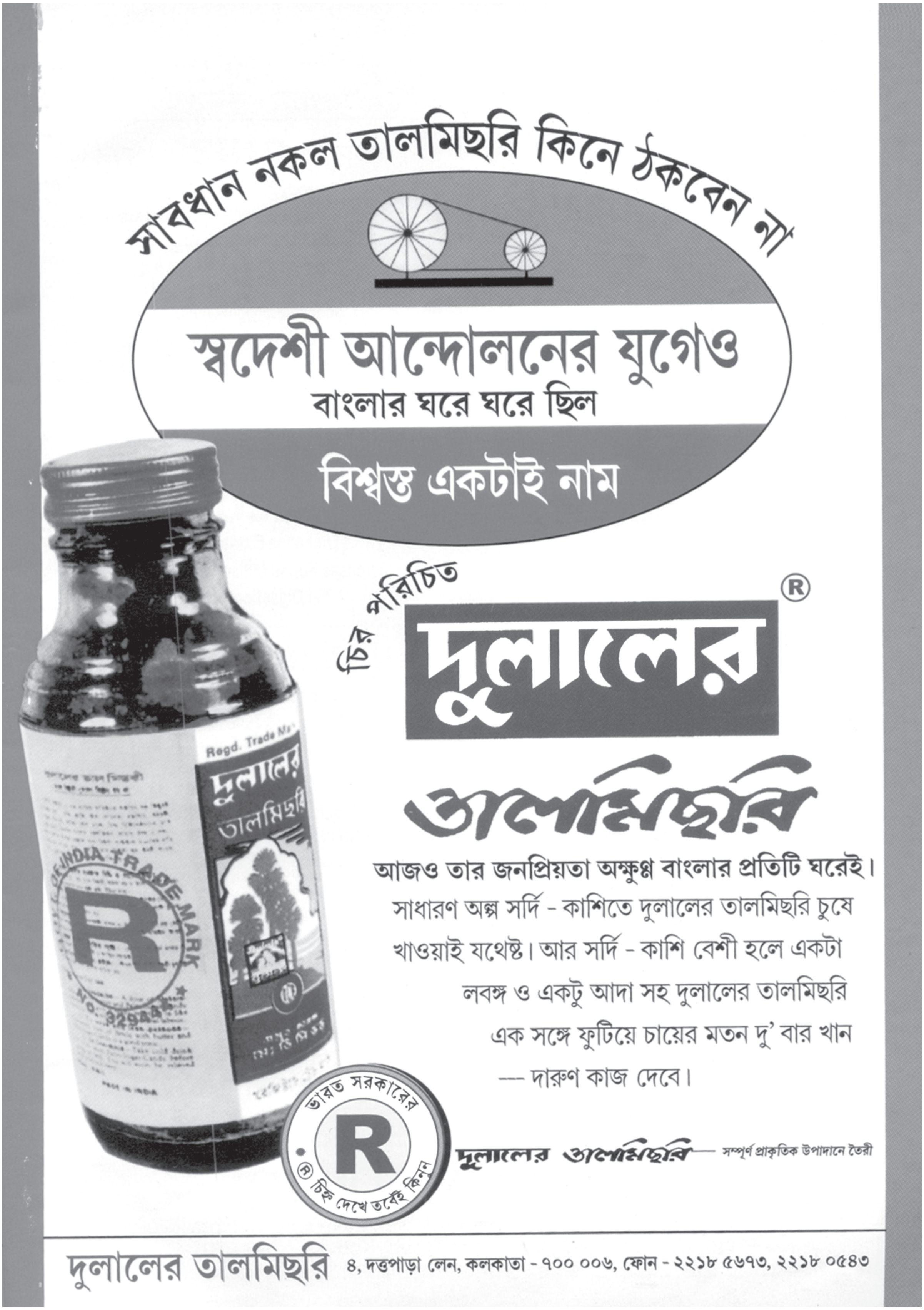
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের
®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু’ বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
R
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

।। চিত্রকথা ।। পরীক্ষিৎ ।। ১৮ ।।

With Best Wishes :-

Radha Electricals Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

বাংলা গান নিয়ে এখনই হতাশ হবার কিছু নেই

তিলক সেনগুপ্ত

অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালেই বাংলার শেষ হিন্দু রাজা হিসাবে যার খোঁজ মেলে তিনি লক্ষ্মণ সেন। হলাযুধ, ধোয়ী, শরণদের নিয়ে কাব্য চর্চা করে দিন কাটছিল তাঁর। কবি জয়দেব পরে রাজ সভায় যোগদান করে সভার শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হন। জয়দেব গোস্বামী রচিত গীতগোবিন্দম্ বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গনে একটা পরিবর্তন প্রায় নিঃশব্দে এনে দেন। বাংলা ঘেঁষা সংস্কৃতে রচিত জয়দেবের এই অমর সুললিত কাব্যগ্রন্থটি বঙ্গ সংস্কৃতি জাগরণের প্রথম দীপশিখা।

জয়দেবের পর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, প্রণয়, বিবাহ, রাগ অনুরাগ, অভিসার আর মিলন ও বিচ্ছেদ নিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় গান বেঁধে ফেললেন মৈথিলি কোকিল বিদ্যাপতি। বাংলার নানুরে রজকিনী কন্যা রামীকে সঙ্গে নিয়ে আদ্যন্ত বাঙ্গালি ছেলে চণ্ডীদাস পদ রচনা করলেন খাঁটি বাংলা ভাষায়। বাংলা গানের ইতিহাস বাঙ্গালি গীতিকার ও সুরকার হিসেবে চণ্ডীদাসকে অমর করে রেখেছে তার অমর সৃষ্টিকে মর্যাদা দিয়ে।

এরপরই বাঙ্গালির হৃদয় আর্তি উন্মোচিত করে বাংলায় ঐতিহাসিক দুঃসময়ের অন্ধকার ভেদ করে দিব্য সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে উদ্ভাসিত হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। অখণ্ড বাংলার প্রথম গণসংগঠক প্রাণবন্ত এই পুরাণপুরুষের অনুপ্রেরণায় বঙ্গভূমে গীতগোবিন্দম্ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী মূর্ত হয়ে উঠল বাঙ্গালির কীর্তন আসরে ঘরে ঘরে।

পরবর্তীকালে তৈরি হলো মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবায়ন গীতি বা রামায়ণী গান। পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হলো কথকতা গান, কবি গান, কবির লড়াই। ওই সময়ে তরজা গান বাংলার গৌড়বঙ্গে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

সময় এগিয়ে চললো। ততদিনে বাংলা সংগীত অঙ্গনে প্রকাশমান হলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, সংগীত শিল্পী। বাংলা গানের ধারায় এক আশ্চর্য সংযোজন হলো। তাঁর গানে— ঈশ্বর, ধর্ম, দেশ, কাল, সমাজ, মানুষ, সমকাল ভাবী কাল অদ্ভুতরূপে ধরা দেয়। একই সঙ্গে প্রেম, বিরহ, মিলন ও বিচ্ছেদ মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে। ছয় ঋতু প্রকাশ পায়। লোকে বলতো রবিবাবুর গান। অভিজাতদের অন্তঃপুর থেকে সাধারণের আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল রবীন্দ্র সংগীত।

বাংলা গানের আর এক সমসাময়িক দিকপতি কাজী নজরুল ইসলাম। কবির রাগাশ্রয়ী বাংলা গান বাঙ্গালির ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালির সংগীত সম্পদের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুল গীতি সম্ভবত ব্যক্তি নাম পরিচয়ে সংগীত হিসাবে শেষ সংযোজন।

কিন্তু রুচি বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনা ও বদলায়। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে অসামান্য সব সুরকার গীতিকার শিল্পীকুল বাংলা গানে নতুন আধুনিক গানের ধারাকে পুষ্ট করেছেন। শত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে আটের দশকের প্রথমদিক অবধি বাংলা গানের স্বর্ণ যুগ। সেই সময় বাংলামায়ের কোলে জন্ম নিয়েছে দেশ বিখ্যাত শিল্পী। গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, সুরকার-গীতিকার সলিল চৌধুরী, মান্না দে, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কত কত নাম।

তবে শুধু আধুনিক গানই নয়, বাংলা লোক সংগীত ও বাংলা গান দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাঙ্গালিকে সমৃদ্ধ করছে। বাউল গান পথ থেকে উঠে এল শহরের অভিজাত মঞ্চে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংগীত ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, টুসু, ভাদু, মনসা, ঝুমুর, গম্ভীরা, জারি, সারি গান, চটকা, মৈষালি, বিয়ের গান, বৃষ্টির গান, ঝাপান, মনসা ভাসান, বোলান গান, রামায়ণী গান, হাপু গান, পৌষলক্ষ্মী বন্দনা, পাঁচালী গান ইত্যাদি লোক সংগীতে বহু ধারা বহু শিল্পীকে প্রতিষ্ঠা দেয়। কিন্তু গত তিন চার দশকে বাংলা গানের জগতে পশ্চিমের জানলার ঝোড়ো বাতাসের দাপটে বন্ধ করা যাচ্ছে না। অপসংস্কৃতির গ্রাসে বাংলা গান তার নিজস্ব গতি হারিয়ে ফেলেছে। যুগের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে আমরা অনুকরণে মেতে উঠছি। ফলে ঐতিহ্যবাহী বাংলা গানের ধারাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

ইদানীং বাঙ্গালির সংগীত জগতে নতুন বাংলা গানের ধারা চালু হয়েছে— জীবনমুখী গান। যার ভাষা চয়ন থেকে উপস্থাপনার উন্মাদনা যেন তামসিক ভাবকেই জাগিয়ে তোলে বেশি। এখানেই শেষ নয়, পাল্লা দিয়ে মাথা তুলছে বাংলা ব্যান্ডের নামে পরম্পরাকে উপেক্ষা ও কটাক্ষ করে গানের শব্দ চয়ন। একই সঙ্গে গানের কথার থেকে যন্ত্রের দাপাদাপিতে কান যেন বধির ও ঝালাপালা হয়ে উঠছে। তবুও এত অবক্ষয় সত্ত্বেও বঙ্গভূমিতে ভালো গায়ক, গীতিকার, সুরকারের অভাব নেই। আমরা তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই হেঁটে চলেছি। সুতরাং এখনই হতাশ হবার কিছু নেই। ■

Sresth Products Private Ltd.

Regd. Off.-
49, Strand Road, Kolkata-700 007

Admn. Off. -
67/50, Strand Road, Kolkata-700 007

AJAY APPARELS

Office :
155B, Rabindra Sarani
3rd Floor,
Kolkata-700007
Ph. 033-2272 7030

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033
Phone :- 24241240/ 7108, Telefax No. 2424-7108
E-mail : epc@epcfans.com
Website : www.epcfan.com

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

দেশের যুবপ্রজন্ম দেশকে আরও শক্তিশালী দেখতে চাইছে

সোমনাথ গোস্বামী

সপ্তদশ লোকসভার প্রাক্কালে দেশ আজ এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী। বাইশটি রাজনৈতিক দল যা আসলে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান তারা আজ জোটবদ্ধ হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে পরাস্ত করতে। কয়েকদিন আগেও যারা একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে লিপ্ত ছিল আজ তারা নিজেদের পরিবারের উত্তরাধিকারীদের অস্তিত্ব সংকটের ভয়ে তথা জায়গিরদারি রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে একে অপরের হাত ধরেছে। একদিকে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির মূল মন্ত্র শুধুই জাতীয়তাবাদ, সেখানে বিরোধী দলগুলির মূল মন্ত্র পারিবারিক প্রতিষ্ঠানবাদ, উত্তরাধিকারীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ। ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ যতরকমের বিভাজনের রাজনীতি আছে তার সবগুলিই তারা প্রয়োগ করতে চাইছে। যদি এই বিভাজনের চোরা গলি দিয়ে নতুন কোনও ভোটব্যাঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে তাদের প্রায় সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে এবং আগামীদিনেও তা ব্যর্থ হবে বলে সকল শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীর বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের ভিত্তিটা কী? এই প্রশ্নের জবাবে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল নানা মতে বিভক্ত। কারো দাবি নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা, কারো দাবি বিজেপির প্রচার কৌশল ইত্যাদি, কিন্তু আসল কারণ লুকিয়ে আছে আরও গভীরে।

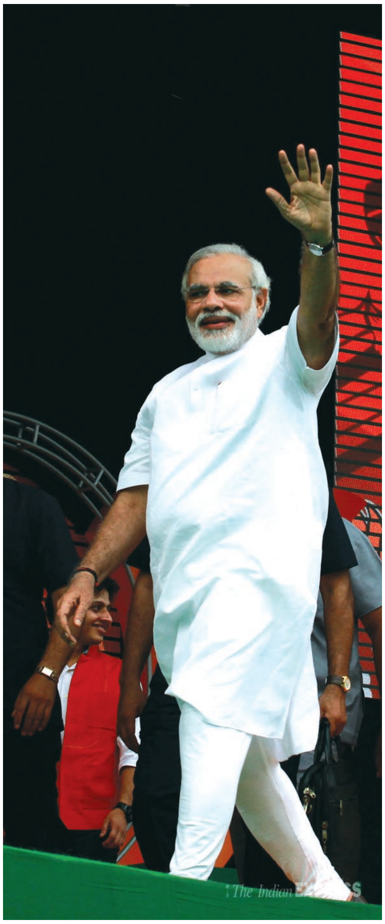

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ সময় একচ্ছত্র শাসনকালে কংগ্রেস যে জাতীয় উন্নয়নের মডেল স্থাপিত করেছিল তাতে ভারতবর্ষে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল যা হলো দরবারি রাজনীতি। অর্থাৎ দেশের কোনও নাগরিককে সরকার থেকে যে কোনো সুবিধা পেতে গেলে তাঁকে তার এলাকার প্রভাবশালী নেতার দরবারে সশরীরে হাজির থেকে নতজানু হয়ে সেই সুবিধার জন্য আবেদন করতে হতো। এবং সেই সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির জাতিগত, ধর্মীয় তথা আঞ্চলিক পরিচয় অনেকাংশেই নির্ণায়ক ভূমিকা নিত। ফলে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষিতে নিজের জায়গাটি পোক্ত করার জন্য ক্রমেই তাঁকে একটি ভোটব্যাঙ্কের শরিক হতে হতো। আর এই জাতিগত, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক ভোটব্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু পরিবার নিজেদের রাজনীতি করে চলতো।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার গঠনের পরপরই এই ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা হয়েছিল এবং তা বহুলাংশেই সফলও হয়েছে। আজ দেশের প্রায় প্রতিটি পরিবারকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় যুক্ত করে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ফলে ধাক্কা খেয়েছে দরবারি রাজনীতি। আজ তাই আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা শুরু করেছে এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পুরোদস্তুর প্রকল্প চুরির পথ বেছে নিয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে ভারত যে জাতীয় অগ্রগতির নিরিখে এক নতুন শিখরে পৌঁছেছে শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে ভারত নামক এই পুণ্যভূমি সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহ্য ও পরিবেশগত দিক থেকেও তার হৃতগৌরব অনেকটাই পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। আজ তাই যেমন দেশ আর্থিক দিক থেকে বিশ্বে এগারো তম স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে, তেমন অন্য দিকে দেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্ন এবং বাসস্থানের পাশাপাশি সুলভ শৌচালয়, দূষণমুক্ত জ্বালানি এবং সাশ্রয়যুক্ত বিদ্যুৎ পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানো যে কোনও নাগরিক জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কোনও রকম মধ্য স্বত্বভোগী ছাড়া যেকোনো সরকারি সুবিধা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী সরাসরি গ্রহণ করতে পারছে আর তাতেই ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলি অশনি সঙ্কেত দেখছে, তাই তারা মহাজোট গঠন করেছে। কিন্তু আজকের ভারত আধুনিক ভারত, যুব সম্প্রদায়ের ভারত যারা, যে যুব সম্প্রদায় এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকে ধূলিসাৎ করে ভারতবর্ষকে আরও উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। যুব সম্প্রদায় নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের সঙ্গে রয়েছে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপির জন্য বিপুল জয় অপেক্ষা করে আছে এটা নিশ্চিত। ■

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

সাপ্তাহিক রাশিফল

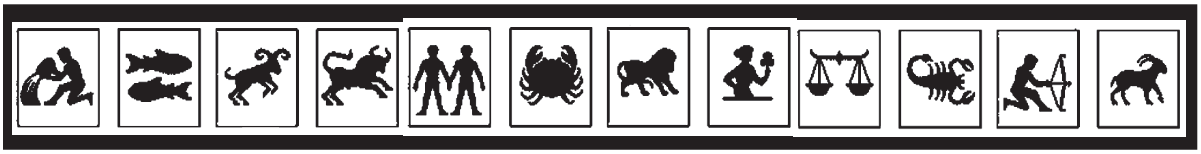

১৫ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ২১ এপ্রিল (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, মঙ্গল, মিথুনে রাহু, ধনুতে বৃহস্পতি, শনি, কেতু, কুম্ভে শুক্র। মীনে বুধ। মঙ্গলবার রাত্রি ২-৩০ মিনিটে শুক্রের মীনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্র থেকে তুলায় বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ পড়াশুনায় বিদ্যার্থীদের মনোযোগ দরকার। কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়বাহুল্যের চাপ। সহোদরের বিদেশ গমনের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তিকর পরিবেশের অবসান। আর্থিক স্থিতি আশাব্যঞ্জক নহে। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা লাঘব। কর্মপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

বৃষ ঃ গৃহ ও সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা। বুদ্ধিমত্তা, স্পষ্টবাদিতা, নীতি-নৈতিকতায় জগতের আনন্দযজ্ঞে সম্মান ও জনপ্রিয়তা। পুরানো মিত্রের মঙ্গললাভ। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য ও জীবনসাথীর শরীরের যত্নের প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়ার, কূটনীতিজ্ঞ ও ক্রীড়াবিদদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি তবে পিত্ত পীড়া ও চলাফেরায় সতর্ক থাকা দরকার।

মিথুন ঃ চিন্তা-চেতনায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ে শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি, কর্তব্যে ত্রুটি। ভ্রাতৃ ও স্ত্রী-বিরোধে স্বাধীন সত্তার অবমাননা। সপ্তাহের মাঝামাঝি বয়োজ্যেষ্ঠের পরামর্শে কর্মে সাফল্য নিশ্চিত করবেন। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সিদ্ধি করায়ত্ব। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতায় অর্থ ও ভাগ্যোন্নতি।

কর্কট ঃ সামাজিক উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে জনপ্রিয়তা ও পেশাগত বিষয়ে পারদর্শিতা। বিবাহ প্রার্থীদের পূর্ণতা প্রাপ্তি তবে প্রেমজ বিষয়ে জটিলতা, সময়ের অপচয়। স্বজনদের আগমন। সখ্য বৃদ্ধি হলেও মিত্রস্থান হিতকারী নহে।

সিংহ ঃ ছলনাময়ী কুহক বা কোনও ব্যক্তির প্রতিশ্রুতিতে আকৃষ্ট হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। সন্তানের মেধার বিকাশ। কর্মপ্রার্থীর পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা। নতুন কাজ, ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। বন্ধুবর্গে সম্প্রতি সরকারি বিভাগে কর্মপ্রতিভায় যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। নতুন আবাস, দূরদেশে ভ্রমণ ও বিলাসবহুল জীবন ও আভিজাত্য বৃদ্ধি।

কন্যা ঃ সঙ্গীতপ্রেমী, ফ্যাশন ডিজাইনার, নৃত্যশিল্পী ও চিত্রকরদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা। কর্মে উৎসাহ ও মনঃসংযোগের অভাব। কোনও সদস্যের বিরূপ আচরণে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট। ন্যায্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা, মান-সম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না। পরোপকারের প্রচেষ্টা। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ।

তুলা ঃ পুরানো গৃহ সংস্কার, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি, কর্মোপলক্ষ্যে সার্থক ভ্রমণ। রমণীর সান্নিধ্য, দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ, দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিতে মনঃকষ্ট। আয়ের নতুন পথের সন্ধান। টাইফয়েড, বদহজম ও ত্বকের রোগে ভোগান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রণ শ্রেয়।

বৃশ্চিক ঃ সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ। কর্ম পরিত্যাগের সম্ভাবনা। যুবক মিত্র হিতকারী নহে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ও বিতর্কিত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। আলটপকা মন্তব্যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সাফল্য। ক্রমিক রোগীদের সতর্কতা ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলা উচিত।

ধনু ঃ গৃহকর্ত্রী, গৃহশ্রী উভয়েরই শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। কীটপতঙ্গ ও জীবাণু থেকে সতর্ক থাকা দরকার। কলাকুশলী, শিল্পী, সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। উদ্যোগী মনোভাব ও বুদ্ধিমত্তায় কর্মদক্ষতায় প্রশংসা প্রাপ্তি। পারিবারিক পরিবেশ ও আর্থিক শুভ। নির্ধারিত বিবাহে বাধা বা হঠাৎ স্থগিত।

মকর ঃ সহোদর ভ্রাতা ও জীবনসঙ্গীর কর্মজনিত যশ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা। প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি। প্রেমের বাধা ও অস্বস্তি। কর্মস্থানে সমস্যা সৃষ্টি হলেও শান্তি বজায় থাকবে, হারানো মূল্যবান সামগ্রীর পুনরুদ্ধার। সন্তানের মন-মেজাজে আধুনিক ছাপ।

কুম্ভ ঃ অযথা ঝুট-ঝামেলা, বিবাদ-বিতর্ক ও বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও মানসিক অস্থিরতা। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার অগ্রগতি ও কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ স্থগিত রাখা শ্রেয়। সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মপ্রাপ্তি ও প্রতিবেশীর সখ্য বৃদ্ধি, নিকট ভ্রমণ। আয়ের শ্লথগতি, ব্যয়বাহুল্য বজায় থাকবে।

মীন ঃ গৃহে অস্বস্তিকর পরিবেশ শান্তির অভাব। মাতার স্বাস্থ্যহানি ঘটলেও মানসিক দৃঢ়তায় পরিস্থিতির মোকাবিলা হবে। দান ধ্যান, পূজা-অর্চনায় আগ্রহ বৃদ্ধি, মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে মানসিক প্রশান্তি। যুক্তিপূর্ণ বাকচাতুর্যে বিরোধিতা হ্রাস। কর্মের যোগসূত্রে প্রেমজ সম্পর্কের নতুন আঙ্গিক।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য

"Om"

M/S. RAJ KUMAR BROTHERS
M/S. R. K. BROTHERS

IRONSTEEL, HARDWARE MERCHANTS
COMMISSION AGENT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF :-

M.S WIRE ROD/ TMT, TATA HB, ANEALED & G.I. BARBED CONCERTINA WIRE, WIRENETTING & CHAIN LINK, WIRE NAILS, K.K. NAILS, PANEL PINS, TARFELT, BOLT NUTS & RIVETS, PLASTIC (POLYTHENE), PVC, GI, CORRUGATED SHEET, ELECTRODES & AGRICO TOOLS ETC.

167, Netaji Subhash Road, (Raja Katra), Kolkata-700 007
Ph. 22580040/41 M- 9830630343
email : sushilbagaria@yahoo.in

With Best
Compliments From :-

Rajesh
Kankaria

Importers of :
EARTHMOVING SPARES & CHAINS

EXPRESS TRADING AGENCIES

P-41, PRINCEP STREET (Ground Floor)
KOLKATA - 700 072

PHONE : Offi. - 3028-4043, 2237-9159.
Fax. - 91-33-2225 8494

SHREE VENKATESH PAPER MART

"KARWA HOUSE"

64, NALINI SETH ROAD, KOLKATA-700 007

Email : svp@cal2.vsnl.net.in / svpoo7@dataone.in

Distributors :

PAPER & PAPER BOARD

Phone : 2274-5398, 2274-0889, 2274-2447, Mobile : 9830026151, Fax : 2274-2164

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

For Enquiry 96741 78500 / 98363 63300

With Compliments
From-

MARCO POLO PRODUCTS (P) LTD

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments
From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Ph. 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

With Best Compliments From :

M/s. OUTBOX CARGO SERVICES LLP

SAGAR ESTATE BUILDING
2, N.C. DUTTA SARANI
ROOM NO. 2, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700001
KAMAL AGARWAL
Contact No.
M : 98300 23126
O : 91-33-40033326 / 40055518
Fax : 91-33-2230-6490
e-mail : info@outboxcargo.com